চতুর্থ অধ্যায়

নির্বাচিত গল্পকারদের ছোটগল্পে

ব্যবহৃত ভাষাশৈলী

ভাষা একটি সৃজনশীল গতিশীল প্রক্রিয়া। একজন মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হল ভাষা। প্রকৃতি জগতের সাথে আবদ্ধ মানুষের মনের অনুভবের নানান স্তর ভাষার মাধ্যমে অন্যের কাছে চাহিদার খোরাক যোগায়। অর্থাৎ ভাষা হল ভাববিনিময়েরও মাধ্যম। আর এই ভাষা— 'মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।'[১]

—এই 'বহুজন' আসলে সমাজবদ্ধ মানুষ। যারা বসবাসের সূত্রে ভাববিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে একই ভাষা জ্ঞানে ব্যবহারিক জীবনযাপনে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। প্রয়োজনে একাধিক ভাষার মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক পরিমন্ডলে বসবাস করেন। এই ভাষা সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানী এডগার এইচ স্টার্টেভান্টের অভিমত হল—

> "A Language is a System of arbitrary Vocal Symbols by which members of a Social group Co-operate and interact.[২]

অর্থাৎ ভাষার সাথে সমাজবদ্ধ মানুষের ভাববিনিময় সম্ভবপর হয় প্রণালীবদ্ধ ধ্বনি সংকেতের মাধ্যমে। এই ধ্বনি শব্দধ্বনি। যা বাক্যে অর্থপূর্ণভাবে প্রযুক্ত হয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষার সংজ্ঞায় বলেছেন—

> "মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।"[৩]

মানুষের চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-হতাশা, দ্বন্দ্ব-মিলন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

দেশ-কাল-সমাজে ভাষার উপযোগিতা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। একজন সাহিত্য স্রষ্টা তাঁর শিল্পকলায় অনন্তভাবকে প্রকাশের জন্য ভাষাকে প্রকাশমাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। চরিতার্থ করেন তাঁর অনুভবকে। সাহিত্য স্রষ্টা তাঁর শিল্প কর্মে ভাষার নিজস্ব একটি শৈলী ব্যবহার করেন। এ ব্যাপারে আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানীর অভিমত হল—

> "Literature is an art-form, like Painting, Sculpture music, drama, and the dance. Literature is distinguished from other art-forms by the medium in which it works : Language."[৪]

বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পদ্যের ভাষা ও গদ্যের ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। আমাদের আলোচ্য গল্পের ভাষায় গদ্যের ব্যবহার রয়েছে। এই গদ্যের ভাষার মধ্যে সাধু-চলিতের সাথে উঠে এসেছে তৎসম, অর্ধ-তৎসম, দেশী-বিদেশি, তদ্ভব, শব্দ ও আঞ্চলিক বেশ কিছু শব্দ। যা বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

মানুষের চিন্তা-চেতনা ভাষার মাধ্যমে সাহিত্যের পাতায় সৃষ্টিশীল হয়। তাই সাহিত্য সৃষ্টিতে এবং মনের উৎকর্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে লেখকের মুন্সিয়ানা নির্ভর করে ভাষার যথাযথ ব্যবহারের ওপর। লেখক একজন সচেতন মানুষ হয়ে চরিত্রানুগ ভাষা ব্যবহার করে বিষয়ের যথাযথ উপস্থাপন করেন। কথ্য ভাষা ব্যবহারে কথকের যেমন দায়িত্ব থাকে তেমনি লেখ্য তথা সাহিত্যিক ভাষা প্রয়োগে লেখকের সম্পূর্ণ ভূমিকা থাকে। এখানে আসলে কথকও শ্রোতা। ফলে প্রচলিত সমাজ ভাষা ব্যবহার ও কথন ভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা লেখকের শিল্পকর্মের লক্ষ্য হয়।

লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনের প্রতিফলন সাহিত্য কর্মের মধ্যে দেখা যায়। এই সাহিত্য সৃষ্টির মূলে রয়েছে ভাষার ব্যবহার। ভাষার ওপর নির্ভর করেই সাহিত্য গড়ে ওঠে। তাছাড়া রচনার মধ্যে চরিত্র নির্মাণের সাথে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও প্লটের বিন্যাস ইত্যাদি ভাবনাগুলিকে লেখক ভাষা দিয়েই গড়ে তোলেন।

একটি বিশেষ অঞ্চলে (রাঢ় অঞ্চল) বসবাসকারী সাহিত্য স্রষ্টা কেবল সেই আঞ্চলিক সীমানার ভাষা অবলম্বনে সাহিত্য সৃজন করেন তা কিন্তু নয়। আঞ্চলিকতায় ভাষা যেমন টিকে থাকে তেমনি নির্দিষ্ট সীমানায় ভাষা জনগোষ্ঠী বা বৃত্তিজীবীদের ভাষা, উপভাষা, লোকভাষা লেখকের কলমে জায়গা করে নেয়। আমাদের নির্বাচিত লেখকদের গল্পের রচনা রীতিতে ভাষাশৈলীর সৃষ্টিকর্মে সংলাপের ভাষা, কাব্যময় ভাষা, ভাষামুদ্রা (Register), বর্ণনার ভাষা, বিশেষণ ব্যবহারের সমান্তরাল ও বিপ্রতীপ প্যাটার্ন, নাম-দাঁড়ি (।) সংলাপ-এর ক্রম, ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ বাক্য, গল্পের শুরু ও শেষে নাটকীয়তা, ক্রমানুসারে প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার, ছেদ-যতি প্রয়োগ, আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার, বর্ণনার ভাষা, উপভাষা, অন্যভাষা ও শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। নির্বাচিত গল্পকার ও গল্পের আলোচনার মাধ্যমে ক্রমশ তা প্রতীয়মান হবে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাঢ়বঙ্গের সুদক্ষ চিত্রকর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্পের জগতে একজন স্বতন্ত্র কারিগর। তাঁর ছোটগল্প বাংলা ছোটগল্পের অজ্ঞাত বিষয় ও বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। ছোটগল্পের প্রচলিত রূপ-রীতি, ছক-বিন্যাস, আঙ্গিক-বিষয়, অলংকার, মিথের পাশাপাশি রাঢ় অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষার প্রয়োগে উন্মোচিত হয়েছে এক ভিন্ন রচনা শৈলী। যা ভিন্ন স্বাদের। তারশঙ্কর তাঁর সাহিত্য জীবনের নানান ধাপে সচেতন শিল্পীর মতো ভাষাচর্চা করেননি। জীবনের অপ্রতিরোধ্য সহজ সত্যের রূপকার তারাশঙ্কর সমকালীন জীবনধর্ম ও অনাগত কাল সচেতন হয়েই তাঁর রচনায় শিল্পীর সার্থকতা প্রমাণ রেখেছেন। ১৯৩০-১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সময়ে তারাশঙ্করের রচনা সাধুরীতি অবলম্বী এবং বর্ণনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বঙ্কিম-শরৎ চন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত। আমাদের আলোচনার সময়কালের (১৯৫০ পরবর্তী) মধ্যে ১৯৫০ সালে 'গার্ড চ্যাটারসনে কাহিনী' গল্পটি সাধুভাষায় লেখা। এবং পরবর্তীকালে রচিত গল্পগুলির ভাষারীতি চলিত গদ্যেই শিল্পরূপ পেয়েছে।

১) তারাশঙ্করের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ গল্পের মধ্যে ক্রিয়াবাচক রীতি বা Verbal Style ব্যবহার করেছেন। আর এই পদ্ধতির সত্যতা দেখার জন্য কয়েকটি গল্পের প্রথম পাঁচটি ও শেষ পাঁচটি বাক্যের শেষে কী কী পদ ব্যবহৃত হয়েছে তা উল্লেখ করব—

ময়দান : ক্রিয়া— উঠেছে, ফুটছে, নঞর্থক— না, বি-কটাহ, ক্রিয়া-ওঠে।

ক্রিয়া— ঘোরে, ঘোরে, ঘোরে, বি-প্রান্তে, বিণ-মিথ্যাবাদিনী।

বরমলাগের মাঠ : ক্রিয়া— করেছে, হয়েছেন, আছে, হয়, বি- রূপ।

বি-বলরাম, ক্রিয়া- চেয়েছিলাম, বি-বলরাম, বি- বরমলাগ্, ক্রিয়া- পড়ল।

জটায়ু : ক্রিয়া— দেয়, ঘটেছে, নাই, হবে, নি।

ক্রিয়া— ছিল, দেখেছিলাম, বললাম, এসেছি, সর্বনাম-আমি।

জগন্নাথের রথ : ক্রিয়া— কাঁদছিলেন, ধারায়, বি- উপর, ক্রিয়া— উঠেছিলাম, বল।

ক্রিয়া— দিত, বি- মেয়েটা, সুমতি, সর্বনাম-তাদের, নঞর্থক- না।

শঙ্করীতলার জঙ্গলে : ক্রিয়া-নামালে, বি- ভোরে, ক্রিয়া– বলে, এসেছে, দেখতে।

ক্রিয়া— পড়ল, এল, কাঁদছিল, বি-মা, ক্রিয়া-ডাকছিল।

বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদ ব্যবহারের এই যৌক্তিকতা লেখকের ভাষাশৈলীর পরিচায়ক। অনেক

সময় গল্পের শুরুতে বাক্যের শেষে ক্রিয়াপদ অনুক্ত রয়েছে তাতেও বাক্যের ক্ষিপ্ততা স্তব্ধ হয়নি। 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' গল্পের শুরুতে ক্রিয়াহীন বাক্যের ব্যবহারে এক অনায়াস চিত্রধর্ম তৈরি হয়েছে এবং ক্ষিপ্রতা এনেছেন লেখক—

> "অজয়ের তীরে একখানি গ্রামে একটি আখড়া। আম-জাম-কাঁঠালের গাছ। গাছগুলির বয়স দশ-বারো বৎসরের বেশি নয়। গুটি চারেক নারকেল গাছ।"[৫]

২. একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া সম্পন্ন দীর্ঘ বাক্যের প্রয়োজনে চরিত্র বা প্রেক্ষাপটের বর্ণনায় লেখক নাটকীয়ভাবে নতুন বাক্যবিন্যাসের প্যাটার্ন নিয়ে থাকেন। যেমন—

ক. "তারপর আবার বললে, মানুষ কিন্তু প্রকৃতির শক্তির কাছে হার মানে না। মানুষ আশ্চর্য! গোটা গ্রামের মানুষ যারা বুক চাপড়াচ্ছিল, তাদের মুখে চোখে ফুটে উঠল সে কি বিস্ময়কর দৃঢ়তা, কঠিন পবিত্র সংকল্প।" (শিলাসন)

খ. "নীলুর জন্যেই বলরাম দেখে শুনে অনেক মেয়ের মধ্যে পছন্দ করে হৈমবতীকে ঘরে এনেছিলেন। হৈমবতী নিজেও সৎমায়ের হাতে বড় হয়েছিল, এমন সৎমা এবং সৎমেয়ে— এ নাকি সেকালে কেউ দেখে নি। হৈমবতীর নিজের মা ছিল প্রখরা ও মুখরা কিন্তু সৎমা ছিল মধুভাষিণী; সেকালে হৈমবতীরও মুখে মধু ছিল।" (জন্মান্তর)

৩. একটি ক্ষুদ্র বাক্য বা শব্দকে বার বার ব্যবহার করার প্রবণতা তারশঙ্করের রচনায় এসেছে। আর এই প্রয়োগের ফলে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যেমন প্রাঞ্জল হয় তেমনি ভাষার শৈলীর সাথে একটি বিষয়গত আবহ তৈরি হয়। যা অনেকটা নাটকীয় চমক দেবার মতো মনে হয়। যেমন—

ক. 'ছুটে এগিয়ে এলো কালী— কি হল ? কি দিলা ?

— ধূলো পড়া।

—না, ওষুধ! কি ওষুধ দিলা ? সাপ মেরা্যা দিলা আমার ? আমার সাপ! কেঁদে ফেলল মেয়েটা! সে একেবারে ঝর-ঝর কান্না; সে কান্না দেখে সন্ন্যাসী যেন অপ্রস্তুত হ'ল।' (সাপুড়ের গল্প)

খ. 'ঘনশ্যামকে ওর ভয় ছিল দারুণ। নিদারুণ ভয়। বাপ রে! সে কি মূর্তি ওর! সারা দেহে কি নিষ্ঠুরতা! বাপ রে! কি প্রচণ্ড শক্তি! উঃ কি প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টান। মাটির বুক ফাটিয়ে একটা গাছ— চার বছরের একটা গাছকে টেনে ছিঁড়ে নিয়েছিল।' (শঙ্করীতলার জঙ্গলে)

— 'ক' ও 'খ' দৃষ্টান্তে শব্দ ও ছোট ছোট বাক্যের পুনরুক্তিতে নাটকীয়তার সাথে আবেগময়তা চমকপ্রদ হয়েছে। আবার 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পেও টুকরো টুকরো বাকবন্ধে নাটকীয়তা ও আবেগময়তা দেখা যায়—

"আমরা বাগ্‌দীর মেয়ে। আমাদের মরদে খুন করে, আমরা লাশ গায়েব করি হুজুর, আমরা লাশ গায়েব করি।"

৪. তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলির গদ্যশৈলীর বক্তব্য উপস্থাপনের সময় নাম, দাঁড়ি ও সংলাপ— এই ক্রম বজায় থাকলেও খুবই কম। যেমন—

ক. "গোবিন্দ। আমার গান শুনেছ বুঝি ? 'যমুনায় ডুব দিয়ে আর উঠব না।'

ভামিনী। শুনেছি। শুনেই চাইলাম। নইলে—

গোবিন্দ। নইলে কি চাইতে ? বল তো শুনি ? কি চাইতে

এসেছিলে ? দাঁড়াও, দাঁড়াও!

ভামিনী। আমি তোমার কাছে—" (বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা)

খ. "গুণীন হাসল।

ডাকিনী তখন হাত বাড়িয়ে বললে— দাও, কাপড় দাও। গুণীন হেসে ঘাড় নাড়লে। —সবুর কর। সবুর কর। কিন্তু যারা গুণীনের সঙ্গী তাদের সবুর হল না। একজন বললে— ছি ভাই! গুণীন তাকে ধমক দিলে— না।" (ডাইনী)

গ. "তোর নাম বল্ এবার।

— আমার নাম ফুলমণি।

— খুব ভাল নাম রে!

— তুর নামটো কি বুললি— সিটা খুব ভাল!

— ওর নাম কি ?

— উর নাম ঝুমরী মেঝেন! তুর বিয়া হয় নাই ঠাক্‌রেন ?" (একটি প্রেমের গল্প)

লক্ষ্য করা যেতে পারে— (৪. ক.) দৃষ্টান্তে নাট্য সংলাপের মতো চরিত্রগুলির নাম পাশে রেখে একটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের ব্যবধানের পর সংলাপ আরম্ভ হয়েছে। (৪.খ.) দৃষ্টান্তে অঙ্গভঙ্গি পরিস্থিতি অনুসারে চরিত্রেরা সংলাপ বলেছে, আবার (৪.গ.) দৃষ্টান্তে (—) ড্যাশ চিহ্নের ব্যবহারে সংলাপ শুরু হয়েছে। কিন্তু চরিত্রের নাম পরে প্রকাশ পেয়েছে। পাঠক মগ্নতাবশত চরিত্রের মধ্যে থেকে সংলাপের সাথে সংযোগ রক্ষা করেন। গল্পের প্রয়োজনে লেখক এ ধরনের সংলাপ পরিবেশনের রীতি রক্ষা করেছেন। যা লেখক মাত্রই স্বাধীনতা গ্রহণ করেন।

৫. শব্দ বা পদের পুনরুক্তি অধিবাচনের বিশ্লেষণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।[৬] যেমন—

ক. 'আনন্দের সন্ধান— আনন্দের ধ্যানমগ্ন চন্দ্রভূষণবাবু সেইখানে বসেই পেয়ে গিয়েছিলেন।' (হেডমাস্টার)

খ. 'গ্রামে ঢুকছে। হর্ণ লাগাও। হট যাও। হট যাও। হট যাও।' (অ্যাক্‌সিডেন্ট)

গ. 'আর দুটি কাজল মাখা চোখ। কাজল মাখা চোখ— কিন্তু সে কাজললতায় পাতা কাজল নয়।' (এ মেয়ে কেমন মেয়ে)

(৫.খ.)-এর দৃষ্টান্তে বাক্যের পুনরুক্তিতে পূর্বাপর সংলগ্নতা বজায় থেকেছে। আবার বাকি দৃষ্টান্তগুলিতে একই শব্দ বা একই জাতীয় শব্দের পুনরুক্তিতে ধ্বনিসাম্যের সাথে অনুসৃত হয়েছে একটি বৃত্ত, একটি চিত্র। যা পাঠকের মানসলোকে নির্মাণ করে দেয় বাক্‌প্রতিমা।

৬. বক্তব্য উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সময় ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভাবনা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন—

ক. 'বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক শেষ হয়ে এল; মানুষের জীবনবাদের সুখনীড় দেউলে-পড়া বনিয়াদী ধনীর দালানের মত ফাটলে ভ'রে গিয়েছে, পলেস্তারা খসা ইটের গাঁথুনির মসলার মধ্যে বট-অশ্বত্থের চারা শিকড় চালিয়ে দস্তুরমত মোটা হয়ে উঠেছে, বনেদের তলায়-তলায় ইদুরে সুড়ঙ্গ কেটে ধসে পড়ার পথ সুগম করেছে।' (বরমলাগের মাঠ)

খ. 'আজ সেকালের পরিবর্তন হয়েছে। ডাইনিতে বিশ্বাস ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে। ডাইনিও আজ আর নাই বললেই হয়। অশিক্ষার গাঢ় অন্ধকারে যারা আজ ডুবে আছে তাদের মধ্যে হয়তো আছে।' (ডাইনি)

৭. 'সাপুড়ের গল্প'-তে ভৈরবের মদের নেশা ও সাপের প্রসঙ্গে ধন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে শব্দময় আবহ গল্পের পটভূমি নির্মাণের সাথে গতিময়তা বৃদ্ধি করেছে। যেমন—

ক. 'দে। আবার খানিকটা গলগল ক'রে গিলে ভৈরব বললে— লে আর এক ঢোঁক খা।'

খ. 'খিলখিল করে হেসে উঠল ভৈরব।'

গ. 'রাত্রির অন্ধকার থমথম করছে চারিদিকে।'

ঘ. 'তারি মধ্যে একটা হাতছানি ঝিলমিল করছে।'

ঙ. 'তারপর সাপিনীর মতো শনশন করে চলল।'

৮. ছোট ছোট বাক্যে ঘটনার পরম্পরা রক্ষিত হয়েছে। যেমন—

ক. 'ছেলেটা ভাড়া করা। ওই ওস্তাদই ভাড়া করে দিয়েছে। সন্ধ্যেবেলা কি যেন খাইয়ে দেয় দুধের সঙ্গে। ভিখারী মায়ের ছেলে। মা মরে গেছে। সেও খালাস পেয়েছে— আমিও নিশ্চিন্ত। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে তাকে খুঁজি। ছেলেটা কাঁদতে থাকে।' (ময়দান)

খ. 'দেখেছিল। মনে কোন সংশয় জাগে নি। দিলুয়া ভাল মেয়ে। একটু লেখাপড়া জানে, বাংলা জানে। ওর দিলুয়াকে ভাল লাগে, ওর দিলুয়াই ভাল। ও মোটর ড্রাইভার, ও মোটর ড্রাইভারের মেয়ে। এই তো এক জাত। কি হবে অন্য জাতে ?' (অ্যাক্‌সিডেন্ট)

— এ ধরনের সরল বাক্য ছাড়া জটিল বাক্য বিন্যাসও দেখা যায়। যেমন—

ক. 'রাত্রে প্রচুর মদ খেয়ে যখন বাড়ি ফিরল তখন আকাশ ভেঙে জল নেমেছে।' (বরমলাগের মাঠ)

খ. 'বলরামের বাপ যখন তাকে টেনে ছাড়ালে, তখন সব শেষ, হত ভাগিনী মরে গেছে তখন।' (বরমলাগের মাঠ)

আবার যৌগিক বাক্য গঠনের সাথে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহারে বাক্যবন্ধের সাবলীলতা দেখা যায়। যেমন—

ক. 'মেয়েটাকে দেখে মনে হয় বোকা— শান্ত, কিন্তু অসাধারণ সহনশীলা, কিংবা হয়তো অবলা।' (শঙ্করীতলার জঙ্গলে)

খ. 'কিন্তু অন্য সব ডাক্তারেরা তার উপর বিরূপ এবং প্রায় খড়্গহস্ত হয়ে উঠল।' (অভিনয়)

গ. 'ভাবেও নি এবং শাড়িখানা পরেও সে ধরতে পারে নি যে তাকে মানাচ্ছে না।' (একটি প্রেমের গল্প)

৯. প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্রমাগত আগমনে ঘটনার ঘনঘটা ও উত্তরের সঞ্চরণশীলতা পাঠকের মনোজগতকে সজাগ করে তোলে। বেশ কয়েকটি গল্পের সংলাপ নির্মাণে এই সত্যতা দেখা যায়। যেমন—

ক. '— তিনি ধর্মশিক্ষা দিয়ে থাকেন ? এও একটা অভিযোগ ? ওঃ! তোমরা ধর্ম মান না ? ঈশ্বর মান না ? বিজ্ঞান মান ? তোমরা কতটুকু পড়েছ বিজ্ঞান ?' (হেডমাস্টার)

খ. '— কাঁদছ কেন ? কেঁদে কি ফল ? এদের কথা ভাবছ না তুমি ?' (অভিনয়)

গ. 'লিবা ? সন্ন্যাসীর জপতপ ভাসায়ে ঝাঁপ দিবা বেদে যুবতীর দেহের দহে ? গো-সাপুরিতে ? গোষ্পদে ?' (সাপুড়ের গল্প)

ঘ. '— হ্যাঁ তাই হল। কিন্তু কে দিলে এই নির্বাসন ? কেন দিলে ?' (কয়েক ফোঁটা রক্ত)

ঙ. 'কে— কে করলে এ কাজ ? রতন রন্টু— ? কে— ? কে ?' (ঐ)

১০. বাক্যের মধ্যে বিশ্লেষণ প্রয়োগের তারতম্য দেখা যায়। কখনো একাধিক বা পরপর বিশেষণের ব্যবহার, আবার কখনো সমান্তরাল প্যাটার্ন, না হয় বিপ্রতীপ প্যাটার্নে বিশেষণ প্রয়োগের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

ক. 'কালো সুন্দর মুখখানার মধ্যে দাঁতগুলো ঝকঝক করত।' (শঙ্করীতলার জঙ্গলে)

খ. 'সেই যে তার কি ক্লান্তি এসেছে, কি অনিদ্রা এসেছে, কি উদ্বেগ তাকে পীড়িত করছে—' (কালো মেয়ে)

গ. 'স্থির নিস্পন্দ নির্নিমেষ দৃষ্টি।' (আলোকাভিসার)

ঘ. 'তৃষ্ণায় উত্তাপে তার বুক যত তপ্তই হয়ে থাক।' (শঙ্করীতলার জঙ্গলে)

(১০. ক ও ঘ) দৃষ্টান্তে বিশেষণের বিপ্রতীপ প্যাটার্ন যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি বাকি দৃষ্টান্তগুলিতে বিশেষণের সমান্তরাল প্যাটার্ন রয়েছে।

১১. বক্তার উচ্চারণের ত্রুটিজনিত কারণে ধ্বনি পরিবর্তনের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

"বোকা বলল— ডারান, ডারান, আমি ডেকি। ও ছিডাম, ছিডাম রে! ছিড্‌মে, অ-ছিড্‌মে।' কিংবা—

'বাবু নটুন ডিডিমণি এছেছে।" (জগন্নাথের রথ)

১২. বেশ কয়েকটি গল্পের বয়ানে লেখক স্বয়ং একটি চরিত্র হিসেবে উপস্থিত। গল্পের ঘটনা বিন্যাসে লেখকের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ধরা পড়ে। যেমন—

ক. "এই সেদিন ১৯৬৪ সালের প্রথমে। আট বছর পর। দেওঘর গিয়েছিলাম। সেখানে একজন মহিলা ডাক্তার আছেন আমার আত্মীয়া। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।" (একটি প্রেমের গল্প)

খ. "আমিই জি. আর. পি. কে বলেছিলাম ওকে হাসপাতালে পাঠাতে। ডাক্তারও আমার চেনা লোক। তাকে পত্র লিখে দিয়েছিলাম একটা সিরাম ইন্‌জেক্‌শন দেবার জন্যে। বিশেষ যত্ন নিতেও অনুরোধ করেছিলাম।" (শিলাসন)

১৩. উপভাষার বৈশিষ্ট্যের সাথে গল্পের পটভূমি ও চরিত্রের বিচরণ ক্ষেত্র নির্ভর করে। ভাষাশৈলীতে উপভাষার বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়। উপভাষা ও লোকভাষার ধ্বনিগত আঞ্চলিকতায় লেখকের ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবনের সম্পর্কের পরিচয় বর্ণিত হয়। তারাশঙ্কর-সৃষ্ট আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যবাহী সাহিত্যকর্মে লোকসাহিত্যের নিবিড় অনুষঙ্গ প্রতিভাত হয়। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস ও গল্পে আঞ্চলিক উপভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

ক. " ...গোটা গেরামের লোকের 'আঙোটজুতি' আমাকে সারাবছর যোগাতে হয়।" (গণদেবতা)

খ. " ...বিয়া! হেঁ করতে হবে। তা একটোকে ধরতে হবে তো! একটোকে ধরলাম— তা ভাল লাগল না। মনামুনি হ'ল না!" (একটি প্রেমের গল্প)

—উদ্ধৃত দুটি দৃষ্টান্তে দক্ষিণ বীরভূমের উপভাষাপুষ্ট শব্দগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন— গেরাম (গ্রাম), আঙোটজুতি (লাঙল বা গরুর গাড়ির উপকরণ), বিয়া (বিয়ে), হেঁ (হ্যাঁ), একটোকে (একটাকে), মনামুনি (মনের মিল)। লেখকের ভাষারীতি একটি বিশেষ অঞ্চলের হলেও আঞ্চলিকতা ছাড়িয়ে সেই রচনা কালজয়ী সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। এখানেই তারাশঙ্কর সর্বকালীন সাহিত্যিক।

১৪. তারাশঙ্করের গল্পের ভাষায় হিন্দি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন— এনতাজ মিয়ার সাথে কালা গোঁসাই-এর কথোপকথন—

"—হ্যাঁ। মাফ তুমকো নেহি করতা, লেকিন— একটা সত্যি কথা বলেছিস— তাতেই তোকে মাফ কর দিয়া। শুনে বেওকুফ হিন্দুলোক, গিধ্বর বুরবক ভেড়ীকে জাত, শুনো। কেয়া ইয়ে শেখ।" (জটায়ু)

গুণময় মান্না

গুণময় মান্নার ছোটগল্পের বয়ানে অভাবী, নিরক্ষর, অল্পশিক্ষিত মানুষদের মুখের ভাষা আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ। কোথাও আবার শহর ও গ্রামের যোগাযোগ সূত্রে মার্জিত ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। মূলত চলিত ভাষা রীতিকেই গল্পকার বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। চলিত গদ্যের বয়ানে ছোট বাক্যের তুলনায় দীর্ঘবাক্যবন্ধেই বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে।

ক) ছোট বাক্যের দৃষ্টান্ত—

১. 'আমাদের লোকটির নাম অনন্ত মন্ডল। বয়স ত্রিশের কাছাকছি।' (নিয়ন্ত্রিত)

২. 'শিলাই নদীর ডাক নাম শুনেছ তো। বৃষ্টি নামলেই হড়কা বান।' (ভূতমন্দির)

খ) দীর্ঘ বাক্যের উদাহরণ—

১. 'কিন্তু হঠাৎ সেই মহিলাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, পিছন ফিরে মধুর হাসলেন, যেন সাদর অভ্যর্থনা করার জন্য তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।" (নিয়ন্ত্রিত)

২. 'সমাদ্দার তার পরদিনই যথারীতি সুপারিশ করে সুশীলকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দিল্লীতে। কিন্তু যা কেউ আশঙ্কা করেনি, ব্যাপারটা তাই হয়ে দাঁড়াল।' (শেষলগ্ন)

গ) সামিজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী গল্পে ভাষামুদ্রা (Register) ব্যবহারের পরিচয় দিয়েছেন।[৭] যেমন—

১. গুণিনের মন্ত্র :

'ওঁহ্রীং ফট ফটাস। বাহুফট, দাফট, দানাফটা, শিরোফট। কার আজ্ঞা ? দেবীর আজ্ঞা ? দেবীর আজ্ঞা।' (উদ্‌ভিদ)

আবার অন্যত্র রয়েছে—

'ভূতপাড়-প্রেতপাড়-দাপাড়-দানাপাড়— বেরি আর পেঁতীর ছাঁ, ঝাঁটার বাড়ি খাবি যা। কার আজ্ঞা, মা শ্মশানকালীর আজ্ঞা।' (উদ্‌ভিদ)

২. গাল-মন্দের ভাষা—

'শুয়ামীকে গাল পাড়ছে, বল কী ?'

'গাল বলে গাল! নিমুরাদে, আবাগীর বেটা, সব্বনেশে...শুধু বাগান, আর গাছ, আর লতা!' (উদ্‌ভিদ)

৩. বিবাহ সংক্রান্ত ভাষা—

''মালতী শুধাল— হ্যাঁ রে ধনু, তা বড় ভাইপোর কোথা ঠিক হল বিয়ার ? কোথাকার মেয়ে ? . . . মেয়ে হচ্ছে দাসফুরের, ওই যে গো শিলাই নদী পেরায়ে যেতে হয়; যদি নাক বরাবর যাইও সেও পাঁচ-ছ কোশ হবে . . . ।'' (তিন বিঘা জমি)

'মেয়ে দেখতে কেমন, গায়ের রঙ কেমন, মেয়ের বাপ কীরকম দেবে থোবে' (তিন বিঘা জমি)

৪. জমি-জায়গা বিষয়ক ভাষা ব্যবহার—

'কথাটা তা নয়, ভাগচাষ আইন যা হয়েছে তাতে বলছে, চাষীর তিন ভাষ, মালিকের একভাগ। আরো সুবিধে আছে, ভাগচাষীর কাছ থেকে মালিক কোনো দিন জমি ছাড়াতে পারবে না। পুরুষানুক্রমে চাষী দখল করবে . . .' (ব্লাড প্রেসর)

ঘ) কাব্যিক ভাষার পরিচয় রয়েছে গুণময় মান্নার গল্পে। যেমন—

১. 'ঈষৎ দৃশ্যমান ওর দাঁতগুলি অত্যন্ত শুভ্র। যা এই আবছা অন্ধকারে ওর সাদা ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে এক সুরে বাঁধা মনে হয়।' (শেষলগ্ন)

২. 'প্লাটফর্মের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। গ্রামের সবুজ-মাঠ ছড়িয়ে রয়েছে দিগন্ত পর্যন্ত। শেষবেলাকার পড়ন্ত রোদ্দুরে কেমন ম্লান দেখাচ্ছে যেন। মনে হয় সারা গ্রামখানা সুবোধের মুখের দিকে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। একটি মূর্তিমতী মিনতির মতো।' (অভিজ্ঞান)

ঙ) বাগ্‌ভঙ্গির সমান্তরালতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

''মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তুলতে পারে, এবং এরপরে নিজের পথ সে নিজেই করে নিতে পারবে।'' (সমস্যাপূরণ)

চ) বর্ণনার ভাষা—

১. দড়ি তৈরির প্রসঙ্গে বর্ণনা—

''খুঁটিতে এক গোছা শণের গোড়ায় দড়ি বেঁধে টাঙিয়ে দিয়েছে, ঝুলে আছে যেন মেয়েদের চুলের রাশ, তার এক একটা গুছি ধরে ঢ্যারাতে পাক দিচ্ছে। তৈরি হচ্ছে এক-সুতোর দড়ি, জড়িয়ে রাখছে চারমুখো ঢ্যারাতেই।'' (ব্লাডপ্রেসর)

২. প্রকৃতি বর্ণনা—

''পূব দিকের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে, পাখি ডাকছে, একটা কাক ডেকে উঠল তেঁতুল গাছের ডালে। ওদের চেনা কাক। ওটা এখন তেঁতুল গাছ থেকে আমগাছে। আমগাছ থেকে সজনে গাছ, সেখান থেকে হয়তো চালের মটকায় এসে বসবে। অনেক দিন আছে। ছেড়ে পালায় না।'' (অহোরাত্র)

৩. মিষ্টি দোকানের বর্ণনা—

''অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারটি বেশ বড়সড়; লম্বায় টানা। চওড়াও নিতান্ত কম নয়। মাটির

দেওয়াল। টালির চাল; পিছনে জানালা থাকলেও দু'পাশে নেই। ঢুকবার মুখে বাঁদিকে কাচের পাল্লা আলমারিতে নানা রকমের মিষ্টি সাজানো।'' (পরিণীতা)

৪. ট্রেন ও স্টেশন সংক্রান্ত ভাষা—

''চন্দ্রকোণা রোড রেল স্টেশন। মালগাড়ির কথা ছেড়ে দিলে এই স্টেশন দিয়ে কয়েক জোড়া যাত্রীবাহী ট্রেন যাতায়াত করে, উজানে এবং ভাটিতে। গোমো প্যাসেঞ্জার, পুরী প্যাসেঞ্জার, খড়্গপুর-আসানসোল প্যাসেঞ্জার—'' (বিকল্পিতা)

ছ) গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে ইংরেজি শব্দ। যেমন—

১. 'তুমি বলেছিলে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে, বাট ইট হ্যাজ চেঞ্জড্ ফর ওআর্স...' (শেষলগ্ন)

২. 'এখন তোমাদের সমস্যা হচ্ছে নট টু আর্ন, বাট হাউ টু রিসিভ! আর, না-না, আমি তোমাদের ডিসকারেজ করছি না...' (ঐ)

৩. 'দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন সমাদ্দার, 'হো আট্ : আর অল দীজ্ ফর...মীনিংলেস!' (ঐ)

৪. 'বাই জোভ, হিজ টকিং অব রেভোল্যুশন, নট ইভেন অ্যাফ্রেড অব ব্লাড শেড...' ('ব্লাড প্রেসর')

জ) অলংকারের ব্যবহার এনে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন গুণময় মান্না। দৃষ্টান্তে দেখা যায় উপমা অলংকার—

'একটা ছাগ শিশুর মতো লাফিয়ে ছুটে এল তাঁর কাছে।' ('লছমীর মুক্তি')

উৎপ্রেক্ষা অলংকার—

'একফালি চাঁদ, আলো অন্ধকার যেন কাজলটানা চোখের চাউনি।' (ঐ)

বাক্যে অনুপ্রাস অলংকার দেখা যায়— 'খাল-খন্দ, খাটাল, খাপরার চাল-ছড়িয়ে রয়েছে।' (শেষলগ্ন)

ঝ) গুণময় মান্নার গল্পের ভাষায় আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন— দেশগুলান, মাদা তৈরি, মুনিষ, শিপনি ইত্যাদি।

ঞ) ক্ষীরপাই-ঘাটাল সংলগ্ন অঞ্চলের পটভূমিতে চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষা বসিয়েছেন লেখক। যথা—

''তুমি আইরেড চালের ভাত খেইচ! উ আবার ভাত না কি, মুখে দিলে ভাতের সুয়াদ আছে ? কেনে জান, তোমার গে ওই রাসায়নিক সার। কী হয় উসব সার ব্যাভার করে— দু'বছর পরে ও জমির দফা-রফা।'' (সার)

মহাশ্বেতা দেবী

শব্দের পর শব্দ কিংবা বাক্যের পর বাক্য নির্মাণের সুনির্দিষ্ট কৌশলেই সাহিত্য প্রতিমা গড়ে ওঠে, তখন শিল্পী তথা সাহিত্যিকের সৃষ্টি হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় ব্যঙ্গ বিদ্রুপের সাথে অপরিসীম মমত্ববোধে চরিত্র গুলি ভালোবাসার নিবিড় অনুষঙ্গে সজীবতা পেয়েছে। সৃষ্ট চরিত্রগুলির ভাষা বা সংলাপ প্রয়োগ যথেষ্ট মানানসই। অবশ্য আপোষহীন ভাষা ব্যবহার রূঢ় বাস্তবতার অনুকূল। তাঁর ছোটগল্পের ভাষা ব্যবহারের নানান দিকে আমরা আলোকপাত করব।

ক) 'দ্রৌপদী' গল্পের সমাপ্তি অংশের ক্ষুরধার সংলাপ চরিত্রের বাস্তবতাকে তুলে ধরে। যেমন—

"দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।"

খ) চলিত ভাষা রীতিতে তাঁর গল্পগুলি নির্মিত। চলিত ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতা ও বোধগম্যতা এবং অন্তরঙ্গ সুর পাঠক-শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে। বাক্যগঠনের দিক থেকে জটিল ও যৌগিক বাক্যের তুলনায় সরলবাক্য এবং ছোট বাক্যের সংখ্যাই বেশি। যেমন—

১. "মাথা নাড়ে ভিখারি। তিনটি টাকা ট্যাঁকে গোঁজা। গাছের ডাল চেঁছে লাঠি বানিয়ে নেয় একটা। তোহ্‌রির হাট থেকে বাটি কিনবে একটা। ভিক্ষাপাত্র। ছ'আনা নিলামে, এক টাকা নিলামে, যা মেলে।'' (মৌল অধিকার ও ভিখারি দুসাদ)

২. "মেয়েটি বসেছিল। অতনু তাকে দেখে চমকিত। সে কিন্তু চমকায় না। একটু সরে গিয়ে বসতে দেয়। চেহারাটা আরও শীর্ণ হয়েছে। কাপড়টা আধময়লা। চিবুকের নিচে একটি হাতও চিন্তামগ্ন।" (কিসে যে কী হয়)

গ) নাম-দাঁড়ি-সংলাপ— এই ক্রমটি মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের ভাষা নির্মাণে তেমন দেখা যায় না।[৮] পঞ্চাশের দশক থেকেই তাঁর রচনাশৈলীতে নিম্নের ক্রমটি দেখা যায়। যেমন—

"—কেউ থাকে না ? কী বলছেন ?

—ঠিকই বলছি...

—না। আপনি চেনেন হিতেনকে ?

—আমি ওনার ম্যানেজার।" (মরা চিঠি)

অবশ্য সংলাপ নির্মাণের এই ক্রমটি পরবর্তীকালেও দেখা যায়—

'—এই যে মাগন!

—হাঁ বাবু!

—ঘুরছিস যে, গার্ড দেখলি কোথাও ?

—না বাবু।

—সব বেটা ফাঁকি দেয়

—জানি না বাবু।' (লাইফার)

ঘ) বাক্যবন্ধের প্রচলিত ক্রম (কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া) তাঁর চলিত গদ্যের সাবলীল বিন্যাসে রয়েছে এবং বাক্যগঠনের উপযুক্ত ক্রম নিম্নরূপেও দেখা যায়।[৯] যেমন—

ক্রিয়া-কর্তা :

'কত কেঁদেছিল ভিখারি'

'লাঠির ভরে চলে ভিখারি দুসাদ' ('মৌল অধিকার ও ভিখারি দুসাদ')

ক্রিয়া-অধিকরণ :

'বলিদানের ভয়ে ভীত মুরগি যেন ঝাপটে বেড়াচ্ছিল বুকের মধ্যে' (হুলমাহার মা)

'বাপ যেখানে মরেছিল, সেখানে ঝাটি জঙ্গল।' (হুলমাহার মা)

'কাল ভোরে চলা শুরু করলেই ঘর' (হুলমাহার মা)

ক্রিয়ার পরে কর্তা :

'অত্যন্ত বিপন্নবোধ করে মাগন' (লাইফার)

'বড়ো বিচলিত হয় মাগন' (লাইফার)

'শালার জমিকে দেখছি আমি' (বিছন)

ক্রিয়ার পরে কর্ম :

'ছুটে যায় বউ শোকতাপ ভুলে' (বিছন)

'ছেলে মেয়ে এসে চুরি করবে এক-দো বস্তা চাল' (শিশু)

কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া :

'তীর্থবাবু ফোন নামিয়ে রাখলেন।' (রং নাম্বার)

'তারপর বিছানায় ফিরে গেলেন।' (রং নাম্বার)

'স্বপ্ন আবার দেখতে হবে।' (রং নাম্বার)

'তীর্থবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন।' (রং নাম্বার)

ঙ) বাক্যের দীর্ঘত্ব, জটিল ও যৌগিক বাক্যের গঠনে-বর্ণনার প্রয়োজনে বিশেষ্যের পাশাপাশি বিশেষণজাতীয় শব্দ ব্যবহারে বাক্যালংকার গড়ে উঠেছে।[১০] বিশেষণ ব্যবহারের বিপ্রতীপ বা সমান্তরাল প্যাটার্ন তাঁর গল্পে দেখা যায়। যেমন—

বিপ্রতীপ প্যাটার্ন:

'অজ্ঞানেই সওয়া যায় না, সজ্ঞানে কেউ ওই যমযন্ত্রণা সইতে পারে ?' (স্তনদায়িনী)

'তাই সে সাদা বালিতে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে ঝুঝার পানে চেয়ে থাকত।' (নুন)

সমান্তরাল প্যাটার্ন:

'সামনে নিশ্চল ও আবদ্ধ জলরাশি।' (জল)

'তারপর শায়িত, নিশ্চল দেহটির দিকে ঝোঁকে।' (গতিগঙ্গা যুগীদাস নাইয়া)

চ) ভালোবাসা শব্দবন্ধটিকে 'ভালবাসা' হিসেবে লিখতেন এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে ধ্বনিসাম্য ভাবের বাহনে রূপ পেয়েছে। যেমন—

'চাঁদের নীচে দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে দেখতে, ওদের হাসি শুনতে শুনতে।' (শিশু)

ছ) গল্পের নামকরণ চরিত্রকেন্দ্রিক (যশবন্তী, দ্রৌপদী, বিছন), বস্তুগত (নুন, ভাত, জল, ঘর ইত্যাদি); বিষয় কেন্দ্রিক (ডাইনি, তালাক, বাঁয়েন, সংরক্ষণ ইত্যাদি) যেমন রয়েছে তেমনি কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দিককে নির্দিষ্ট বক্তব্যে প্রতিকায়িত করেছেন।

ভগীরথ মিশ্র

ভগীরথ মিশ্রের গল্পের ভাষায় রাঢ়ী উপভাষার সাথে বঙ্গালী ও ঝাড়খন্ডী উপভাষার পরিচয় কম বেশি ধরা রয়েছে। কয়েকটি গল্পের আলোচনায় তা স্পষ্ট হবে। যেমন—

১) 'দ্যাখেন তালে, আমাগো সোদপুরেও অমন পোলাপান রইসে। এ্যাই, চল্ চল্ এখনো পুরো এলাকাটা বাকি পইর‍্যা রইসে।' (মিডফিল্ডার)

উদ্ধৃতিটিতে বঙ্গালী উপভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

ক) অর্ধ-সংবৃত 'এ' ধ্বনি অর্ধ-বিবৃত 'এ' (এ্যা) ধ্বনি রূপে দেখা যায়। [১১] যেমন— দেখুন > দ্যাখেন কিংবা এই > এ্যাই।

খ) শব্দের শুরুতে 'এ' কখনো কখনো 'অ' হয়। এমন > অমন। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য কামরূপ উপভাষাতেও থাকে।

গ) অপিনিহিতের স্বর বজায় রয়েছে বঙ্গালী উপভাষায়। তাই পড়িয়া/পরিয়া > 'পইর‍্যা' হয়েছে। আসলে পড়িয়া > পইড়্যা, ড় ধ্বনি 'র' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে এখানে।

ঘ) কখনো কখনো ক্রিয়াপদের শেষে 'স ধ্বনির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন— রহিয়াছে > রইসে।

ঙ) 'পোলাপান' শব্দটি বঙ্গালী উপভাষা জাত।

চ) আবার আলোচ্য গল্পে 'কোন কথাডা' বাক্যের 'কথাডা' (কথাটা থেকে হয়েছে) অর্থাৎ এখানে ঘোষীভবন হয়েছে।

২) 'একটু থেমে রাইমণি বলল, যৈবনকালে মেয়া মাইনসের মন গরুর মতন। ফাঁকতাল পালেই উধাও হবার চায়। বুড়া ত মুর খুঁটা গ, দুদিনের তরে কুথাও গ্যালে আইটাই করতি লাগে উর মনটা।' (লেবারণ বাদ্যিগর)

উদাহরণটি বঙ্গালী উপভাষার চমৎকার বৈশিষ্ট্যবাহী। এখানে—

ক) সম্বোধন অর্থে 'গ' এর ব্যবহার রয়েছে।

খ) কখনো কখনো বাড়তি 'ই' বা 'য'(্য) ফলার ব্যবহার বঙ্গালীতে দেখা যায়। যেমন—

মাইন্‌সের < মানুষের। গ্যালে < গেলে।

গ) 'ও' কারের উ-কার প্রবণতা। যেমন— কুথাও < কোথাও ; মুর < মোর, খুঁটা < খোটা; উর < ওর।

ঘ) জন্যে অর্থে 'তরে' শব্দের ব্যবহার। যেমন— দুদিনের তরে < দু দিনের জন্য।

৪) ভগীরথ মিশ্রের গল্পে গ্রামীণ জীবনযাপনের সাথে যুক্ত অশিক্ষিত অভাবী মানুষেরা সামান্য চাহিদা পূরণের জন্য সংগ্রামী হয়ে ওঠে। অস্পষ্ট কথার মাধ্যমে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়। দায়ভার লেখক নেন। ধীর বিশ্লেষণে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমস্যাগুলি যেন ক্রমশ একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি থেকে বৃহৎ ও স্পষ্ট আলোকে তা ধরা দেয়, এমনকি চরিত্র বা ঘটনার মূল বিবরণীসহ। ঘর-গেরস্থালি প্রসঙ্গে লেখক বলেন—

> "আকাশে আজ ছানাকাটা মেঘ। তার মানে বৃষ্টি হবে না। কিন্তু কালরাতে হয়েছিল। কাঁচা রাস্তায় কাদা রয়েছে। খানা-খন্দে জল। বাসনার ঘরখানি দেখে ভালো লাগে বিকাশের। মাটির দেওয়াল। খড়ের চাল। একফালি বারান্দা। সামনে এক চিলতে উঠোন। উঠোনের মধ্যিখানে মাটির বেদির ওপর হৃষ্টপুষ্ট তুলসী গাছ। বারান্দা, উঠোন, সব ঝকঝক করছে।" (বিষকপ্পুর)

৫) 'কদলডালির সাধু' গল্পে সাধুচরণ পেশাদার চোর। এখন নব্বুই বছর বয়সে না খেতে পেয়ে মরণের অপেক্ষায় রয়েছে। বাস্তব জীবন কথা এ গল্পের মধ্যে চমৎকারভাবে বর্ণিত। অভাব ও ক্ষুধার জ্বালা যে কতটা মর্মান্তিক পরিণতিতে পৌঁছেছিল গল্পকার নাটকীয়তা সৃষ্টি করে সেই পরিচয় তুলে ধরেছেন—

> "গড়ের সব চাল তুলে পাশে ডাঁই করে রাখা। বৌটা ঢেঁকি তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাধু চোখের পলকে এক কান্ড করে বসলো। বৌটা কিচ্ছু বুঝে ওঠার আগেই ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে টেনে নিয়ে শুইয়ে দিলো গড়ের ওপর। গড়ের ওপর ঘুমন্ত বাচ্চা, ওপরে ঢেঁকির মুষল। সাধু জানে এরপর কি হবে। আতঙ্কে, আশঙ্কায় বৌ কাঠ। পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলো ছেলের দিকে।"

৬) গল্পে প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে লেখকের ভাষার বর্ণালী ধরা রয়েছে। যেমন—

ক) "বোশেখ মাসের ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। আকাশটা ঝলসে যাচ্ছে। মাথার ওপর গন্‌গনে সূর্যটা তেতে পুড়ে লাল টকটকে। মাঠঘাট জ্বলে পুড়ে খাক্।" (কদমডালির সাধু)

খ) "নদীর ওপারে, টিলার আড়ালে সিঁদুরের টিপের মতো সূর্য ডুবছে। লালচে বালির বুক থেকে উধাও হয়ে গেছে রোদ্দুর। চারপাশ কেমন নিঝ্‌ঝুম হয়ে আসছে।" (নেশা)

গ) ঘোতনের অল্প বয়সে টাক পড়া নিয়ে হাস্যরসময় বর্ণনা তুলে ধরেছেন লেখক, যা সাহিত্যরস সমৃদ্ধ—

> "কোন্ এক রহস্যময় কারণে, তিরিশ না ছুঁতেই টাক পড়তে শুরু করেছে ঘোতনের

মাথায়। পর্বটা শুরু হয়েছে কপালের দিক থেকে। শুরু হয়েই থেমে নেই। 'প্রশস্ত ললাট মার্কা' টাক দিয়ে শুরু করে সেটা ক্রমশ আগ্রাসী সমুদ্রের মতোই খেয়ে নিচ্ছে, পরিপাটি করে গড়ে তোলা দীঘাভূমির পাড়। খেয়ে নিচ্ছে যাবতীয় ঘন কালচে ঠাসু বুনোট ঝাউবন।'' (মিডফিল্ডার)

ভগীরথ মিশ্রের প্রতিটি গল্পের নামকরণ যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী। কেবল অর্থগত নয় নামের মধ্যে গভীর ব্যঞ্জনা লুকিয়ে থাকে। 'কদম ডালির সাধু' গল্পের 'সাধুচরণ', 'সুবচনী' গল্পের 'সুবচনী'র মতো চরিত্র যেমন প্রতীকী হয়েছে তেমনি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় গভীর ব্যঞ্জনা লুকিয়ে রয়েছে। লেখকের 'নেশা' গল্পে ফিল্মস্টার তিমির বরণের মধ্যে আনন্দে ও শান্তিতে বেঁচে থাকার (নেশার) পরিচয় রয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের জীবন প্রকৃত সুন্দর জীবন হতে পারে না। এই বোধ জন্মেছে চরিত্রটির মধ্যে। ফেমাস লোকেদের জীবনচর্যায় বড় ক্লান্তিবোধ হত। ফলে ক্লান্তিজনিত ক্ষয় থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে তিমিরবরণ। লেখক মুক্তির ঠিকানা বলেছেন—

''আসলে মানুষের জীবনে যতি চাই, অবসর চাই, বিনোদন চাই। চাই টাটকা বাতাস। মাঝে মাঝে দু-এক পশলা বৃষ্টি। চাই খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখবার সুযোগ। বহুদিন ধরে এগুলোই পাচ্ছিলেন না তিমিরবরণ।'' (নেশা)

কথাসূত্রে কখনও কখনও সুভাষণের বিপরীত রীতিতে বাক্যবন্ধ তৈরী করেছেন ভগীরথ মিশ্র। যেখানে সুবাচনিক শব্দগুলো ধ্বনি ঝংকারে একটি বিশেষ পরিবেশ বা সাময়িক একটি পরিস্থিতির পরিচয় তুলে ধরে। মনে হবে চেনা মানুষের মুখে সুভাষণ হারিয়ে গেছে দেখা দিয়েছে দুর্ভাষণ (Pejoration)। এই রীতিতে লেখক মনের ভাবকে সযত্নে ভালোবেসে আদরণীয় অর্থে মূলত উচ্চারণের জন্য দুর্ভাষণ সৃষ্টি করেছেন। যেমন—

''হ্যাঁ রে মাগী— ত'র বরের হাট ফুরাই গেল।' হাঁফাতে হাঁফাতে নাতনিকে গাল পাড়ে কান্চারাম, তুই বরং আগে যা। ভালো বর সব বিক্রি হইয়ে গেলে, ত'র ভাগ্যে জুটবে কানা, লুলা...।'' (নেশা)

এখানে নাতনিকে গালাগাল আসলে মিষ্টভাবের গোপনতায় দুর্ভাষণ হয়েছে বলা যায়। এই ধরনের ভাষার প্রয়োগ সমাজ জীবনের সাথে যথেষ্ট মানানসই হয়েছে।

অমর মিত্র

মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে ভাষার মধ্য দিয়ে। অবশ্য ভাষা ছাড়া সংকেতের ব্যবহারেও মনের ভাব বিনিময় হয়, আর তা দেখা যায় মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীদের মধ্যে। নিজের উপলব্ধিকে সঠিকভাবে অন্যের কাছে পৌঁছে দেবার অন্যতম মাধ্যম হল এই ভাষা। তা গদ্য বা পদ্য দুই ভাবেই হয়ে থাকে। গদ্য বা পদ্যের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি হলেও গল্পের ভাষা হল গদ্য। যেখানে সাধু বা চলিত ভাষার সাবলীলতা সহজেই চোখে পড়ে। তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সংযোগে নির্মিত হয় সাধুভাষার কাঠামো। আর দেশি, বিদেশী তদ্ভব শব্দের দ্বারা বাক্যগঠনে গড়ে ওঠে চলিত ভাষা। সাহিত্য নির্মাণের কৌশলে ভাষার ভূমিকা রয়েছে। সেখানে সাহিত্যিকের যেমন পান্ডিত্যের পরিচয় থাকে তেমনি সাহিত্যের সাথে সেই সাহিত্য পাঠকের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের সূত্র তৈরীর ক্ষমতা সাহিত্যিকের থাকে। কাজেই লেখক হলেন সাহিত্যস্রষ্টা তথা সমাজ পরিবেশ ও সময়ের সাহিত্যসাধক।

সত্তর-আশির দশকে গল্পকার হিসেবে অমর মিত্রের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় মেলে। এই সময়ের গল্পের মধ্যে নতুন আঙ্গিকের সাথে কথকতার পুরানো ধারা পাল্টে নতুন ভাবনায় গ্রামীণ ঐতিহ্যের সাথে গ্রামীণ বাক্‌রীতির প্রকাশভঙ্গির পরিচয় উঠে এসেছে। ফলে চেনা ছকের বাইরে গিয়ে চেনা পরিচিত জীবন কথাকে ভাষার সাবলীলতায় ধরে রাখতে চেয়েছেন অমর মিত্র। যেখানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ভাষার মাধ্যমে প্রাণবন্ত হয়েছে। আসলে গ্রাম্য জীবন সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অন্বেষণ লেখককে চরিত্র নির্মাণে যেমন সহায়তা করেছে তেমনি চরিত্রের মুখে ভাষা বয়ান নির্মাণ তথা কথনতত্ত্ব গঠনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। লেখক সমাজ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে বলবার মতো সাহসে, লেখার মতো চলনসই ও সৃষ্টিশীল ভাষায় সাজিয়ে দিয়েছেন। ফলে পাঠকের কাছে লেখক ধরা রয়েছে সাহিত্য জ্ঞানের ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি ভাষাবিদ্ হিসেবে। গল্পকার অমর মিত্রের ভাষা ও চরিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে সমালোচনা করেছেন বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়—

> "অমর মিত্র মধ্যশ্রেণীর শুভবুদ্ধি, নীতিবোধ, পরশ্রীকাতরতা দেখেছেন একেবারে তাদেরই একজন হিসেবে। ফলে ঐ জীবনের কানাগলিতে উঁকি মারতে চেষ্টা করেন নি, যদিও করলে ব্যর্থ হতেন না। কিন্তু Involvment ও detachment নিয়ে লেখা ভূমিজীবী মানুষের গল্পে। সাঁওতাল, মুন্ডা তথা সর্বহারা অন্ত্যজদের জীবনের গল্পে, দরিদ্র মুসলমান পরিবারের গল্পে এবং স্বপ্ন ও রিয়ালিটির মিশেল দেওয়া গল্পে সমীহ আদায় করার মত 'কমিটেড' শিল্পী তিনি এবং তাঁর 'কমিন্টমেন্ট' শিল্পের প্রতিবন্ধক হয়নি চরিত্র ও পরিবেশ-শোভন ভাষাশৈলীর গুণে।" [১২]

সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলনের অভিঘাতে গ্রাম্য জীবনে যে জটিল জীবনচর্যা দেখা দেয়, গড়ে ওঠে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা। এর প্রতিসরণ হিসেবে আশির দশকের গল্পের মধ্যে নেতিবাস্তবতা যেমন ছিল তেমনি নব্বই-এর দশকের গল্পের ভাষায় নব রূপায়ণ দেখা দেয়। 'শাপভ্রষ্টা', 'সাদামানুষ'-এর মতো গল্পের ভাষার প্রাঞ্জলতা লেখকের ভাষাশৈলীর কৌশলকে প্রমাণ করে। গ্রাম্য সংলাপের প্রাচুর্যতায় গড়া 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ' (১৯৭৪) নামে গল্পটি। গ্রাম্য সমাজের প্রান্তিক মানুষের চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্বে তাদের সংগ্রামী জীবন কথা বলে ওঠে। রূপাই চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক দারিদ্র্য ক্লিষ্ট অসহায় অথচ সংগ্রামী মানুষের জীবনের উত্থান পতনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। রূপাই তার স্বপ্নসৌধ নির্মাণ করেছে ভবিষ্যতের কথা ভেবে। আর এ ভাষার ব্যবহার পশ্চিম রাঢ়ী উপভাষার। [১৩] লেখক বলেছেন—

> "হেই হামার ঘর হব্যা জমিন হব্যা সি সঙ্গে ইক মেয়্যামানুষও বটে। গুলাপী কাপড়, হলুদ বিলাউজ মাথায় জবা, ঝুমঝুমাঝুম মলের শব্দ! তার নেশা চরমে। হেই ঝুমঝুমাঝুম মলের শব্দ! রাতভর মেয়্যাপুরুষে সুহাগ। সুহাগে সুহাগে শীত পালাবে হই হুড়াহুড়ার ঘাট পেরুয়ে মাঠ পেরুয়ে বগ্‌লাশুনি। সিথায় বাবুর ঘরে খুব শীত— বাবুর ঘরে তিনটা মাগেও খুব শীত, হা-হা-হা। সে জ্যোৎস্নার ভিতর হাঁটতে হাঁটতে দমকা হাসিতে ফেটে পড়ে।" (মাঠ ভাঙে কালপুরুষ)

নিম্নবর্গের মানুষের প্রতিনিধি রূপাই যেন প্রতীক ধর্মীতায় গল্পের সমাপ্তি অংশে কালপুরুষের দীর্ঘ ছায়ায় প্রতিবাদী সত্তার মুখোমুখি হয়েছে। রূপাই-এর ঘর বাঁধার স্বপ্ন সার্থক না হলেও সে রাজা ও প্রজার পার্থক্য অনুভব করেছে। গল্পকার রূপাই চরিত্রে রূপদানের মধ্য দিয়ে কাব্যময় ভাষায় চিত্রকল্পের পরিচয় তুলে ধরেছেন যা গল্প বয়ানে মানানসই বলেই মনে হয়—

> "ভরা আশ্বিনে সব্‌জে ফসল লকলকায়, আর লকলকায়। ভাদ্রের আকাশে বক ভাসে, বকেরা পালক উড়িয়ে কোথায় চলে যায়। বকের পালক মেঘ হয়। আশ্বিনের আকাশে তারা ফোটে, আসে উত্তরে বাতাস অতি সন্তর্পণে। বাতাসে বাতাসে ফসলের সবুজ রঙ কোথায় পালায়।" (মাঠ ভাঙে কালপুরুষ)

অমর মিত্র অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে গ্রাম্য জীবন কথা তথা ভাষাকে গল্পের চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নব্বই-এর দশকে গল্পের কাহিনী যেমন নতুন মাত্রা পেয়েছে তেমনি ভাষার স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলতা শব্দ চয়নের নিপুণতা, অলংকারের প্রাচুর্য, বিষয় বর্ণনার অন্তর্জালে কিম্বা পরিচ্ছন্ন বিষয় বিন্যাসে অমর মিত্রের রচনা শৈলী অনেক বেশি পাঠক মহলে জনপ্রিয় হয়েছে। আসলে সময়ের প্রবাহের ভাঙাগোড়ার সাথে লেখক মানানসই শব্দ চয়নে ও ভাষা ব্যবহারের উপযুক্ত সাহিত্য সাধক রূপে প্রমাণ করেছেন। অমর মিত্রের সাহিত্য কর্মের এই ভাঙাগড়ার প্রসঙ্গে রুশতী সেন-এর মন্তব্যটি যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত হয়েছে—

> "নিজের ভাষাকে ভাঙতে ভাঙতে গড়েতে গড়তে অমর মিত্র এই সাম্প্রতিকতম গল্পগুলিতে যে সাধনায় মগ্ন, সেখানে তিনি যেন নীরবতাকেই যথার্থ সরব দেখতে

চান, পরোক্ষেই প্রত্যক্ষের সবচেয়ে অর্থময় ব্যঞ্জনা ফোটাতে চান। এ ভাষায় প্রতিবাদের কোনো ঢালাও আয়োজন নেই। বরং প্রতিবাদহীনতার অন্তর্লীন প্রতিবাদেই যেন আজকের সাহিত্যের সব থেকে বিশ্বাসযোগ্য বয়ানটি লেখক বানাতে চান।" [১৪]

কথা শেষ হলে নীরবতার মধ্যেও আপাত সম্ভাবনাময় অনেক কথা যেমন লুকিয়ে থাকে। লুকিয়ে থাকে পরকথা, পরের কথা, বিষয়হীন শব্দহীন অন্তর্হীন নীরবতায়ও যেন সজীবতা থাকার মতো। ভাষার মধ্যেও তেমনি একটা বার্তা বাহিত হয়, অমর মিত্রের ভাষায় তথা গল্পকথায় সেই পরিচয় রয়েছে। 'শাপভ্রষ্টা' (১৯৯৬) গল্পে প্লটের পরতে পরতে গড়ে উঠেছে ক্রমাগত কাব্যময় ভাষার বুনন। অদ্রীশের পত্নী কাবেরী সাজানো ঘরসংসার ছেড়ে ইহলোকে চলে গেছে। রেখে গেছে অদ্রীশ ও তাদের ছেলে বুবুনকে— আর নিজের হাতে গড়া পরম যত্নের সংসার ও বাড়িটি। কাবেরীর চলে যাওয়া অদ্রীশ ও পুত্র বুবুনের কাছে চরম আঘাতের। অথচ বুবুন স্বপ্নে মাকে বহুবার দেখলেও অদ্রীশ দেখেনি। এই আপাত সম্পর্ক তাকে স্বপ্নে তেমন ধরা দেয়নি, নাড়া দেয় না। অদ্রীশ অফিসের সহকর্মী নূপুরের সাথে পুনরায় ঘর বাঁধার কথা ভেবেছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত কথা এগিয়ে থেমে গেছে। এক অলৌকিকতায় তথা পৌরাণিকতায় গল্পের সমাপ্তি প্রসঙ্গ এনেছেন অমরমিত্র। এ ভাবনা ও ভাষা চিরকালীন আবেদনে মথিত—

"এরপর ক'বছর গেল। সে ভুলতে লাগল কাবেরীর কথা। নূপুরের কথাও। তার বয়সও হয়ে গেল আচমকা। এখন মনে পড়ে এই বাড়িতে কেউ যেন এসেছিল। রূপের আলোয় এই বাড়িটি ভেসে গিয়েছিল তখন। সে যখন সন্তান রেখে উধাও হয়ে গেল, তখনই টের পেল অদ্রীশ। আসলে সে ছিল শাপভ্রষ্টা কোনও দেবী, ঊর্বশী। পুরাণের সেই নারী। তার প্রয়োজন ফুরিয়েছিল এ পৃথিবীতে, তাই কোনও মায়া না রেখে চলে গেছে দেবলোকে, ইন্দ্রলোকে। সে যে এসেছিল তার চিহ্ন ওই সন্তানে।"
(শাপভ্রষ্টা)

এরূপ রহস্যময় কাহিনী বয়ানের ভাষা 'নির্বাসিতা' (১৯৯১), 'রাতের কড়া নাড়া' (১৯৯৫), 'চাঁদবালি' (১৯৯৫) নামক গল্পগুলির সমাপ্তি অংশে নবমাত্রা সংযোজন করেছে লেখক। আর পাঠকও অচিন দেশের পথে গল্পপাঠের শেষে হারিয়ে যায়— এখানেই গল্পকার অমর মিত্রের ভাষা বয়ানের মুন্সিয়ানা।

'রাতের কড়া নাড়া' গল্পের হীরেন-এর বোন রাকার বিয়ে হয় কল্যাণীতে। পুলিশের চাকরি, এস.আই. জামাই। বিয়ের এক বছরের মাথায় বাপের বাড়িতে তথা হীরেনের ফ্ল্যাট বাড়িতে খবর আসে রাকা পালিয়ে গেছে। কিন্তু এই ফ্ল্যাট বাড়ির বাসিন্দা বরেন-এর বউ রুবির মনে হয়েছে রাকাকে তারা মেরে ফেলেছে। তা না হলে এই অন্তর্ধান হওয়া মানায় না। শুভ্রা বলে মেয়েটি অচিন্ত্যর মতো স্বামীকে আর্থিক দিক থেকে দাঁড় করিয়েছে। একথা জানিয়েছে বরেন। এরপর রুবি ধীর পায়ে বরেনের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। গাঢ় অন্ধকারের মাঝে যেন হারিয়ে যায় ভাষা— রুবির অভিগমনে—

"বরেন এতক্ষণে যেন নিশ্চিন্ত হল। সোফায় কাত হল। তখন ডোর বেল বাজল। বরেন কান পেতে থাকল। রুবির পায়ের শব্দ শোনা যায় কি ? রুবি কি দরজার

দিকে যাচ্ছে ? বরেন চোখ বোজে। চারদিক কেমন স্তব্ধ হয়ে আছে। হ্যাঁ এই সকালেও। মানুষজন যেন ঘুম থেকেই ওঠেনি। চোখ বুজলেই অন্ধকার। বরেনের মনে হয় রাত। মনে করলে দিনও রাত হয়ে যেতে কতক্ষণ।" (রাতের কড়া নাড়া)

এই উদ্ভট ভাবনা যে জীবনের ক্ষেত্রেও সম্ভব তা বরেনের মতো বিচক্ষণ মানুষ বুঝেছে। আর গল্পকারের গভীর দৃষ্টিভঙ্গীর সজাগ বিশ্লেষণী শক্তি এখানে সমাধানসূত্র রচনা করেছে মাত্র। গল্পের সমাপ্তি অংশের এই অসীম, অপার রহস্যময়তা 'চাঁদবালি' গল্পের মধ্যে গল্পকার এনেছেন। বাবলি, ঊষা, রমা-রা নৈঃশব্দে, অন্ধকারে আকাশের পানে তাকিয়েছে—

"সকলে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। আকাশ অন্ধকার। গ্রহনক্ষত্র সব উধাও। খালের ওপারে বিন্দু বিন্দু আলো। রকেট উৎক্ষেপণ ক্ষেত্রে যেমন হয়। সারারাত নৈঃশব্দ্য চিরে, গভীর প্রশান্তি ভেদ করে জ্বালামুখের আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে কালো আকাশে, সেই আকাশে, যা ছিল তারকের চোখের মণি, রমা ঊষা বাবলির পরম ভালোবাসা। এই ছাই ঝরানো আকাশ দেখে সকলে।" (চাঁদবালি)

'নির্বাসিতা' গল্পে বোন রত্না-র বৈধব্যের কারণে অরুণাভ বিচলিত হয়। এমনকি তার মা ও বউ অলকা এই শোককে মেনে নিতে পারেনি। রত্না সন্তান কোলে মহাকালে, মঙ্গলনাথ মন্দিরে, শিপ্রার কূলে কূলে মন্দিরে সে পুজো দিয়ে চলেছে। কারণ কলকাতার মানুষকে সে (রত্না) কষ্ট দিতে পারবে না। ভালোবাসার গোপন অনুরাগে বিরহতাপিত জীবনে সে অসহায়। লেখক অমর মিত্র গল্পের নামকরণের সাথে চরিত্রের নাম, স্থান নাম এবং দূরত্বানুসারে চরিত্রগুলির মানসিক অস্থিরতাকে যেন 'মেঘদূত' কাব্যের যক্ষ-যক্ষীর বিরহ বেদনার রূপকে তুলে ধরেছেন। আর গল্পভাষায় অলৌকিকতা এনে গল্পের সমাপ্তি দেখিয়েছেন—

"মেঘ, হে মেঘ তুমি পূব দেশে গিয়ে হুগলি নদীর কূলে একটি নগর দেখতে পাবে, সেই নগরে খুঁজে খুঁজে পেয়ে যাবে আমার পরিজন, প্রতিবেশীরা আছে যে জীর্ণ অট্টালিকায় তা। ...বহুদিন তার বাসিন্দাদের বুকে আনন্দ জাগেনি, এক নিঝুম থমথমে পুরী যেন বা। মেঘ তুমি বলো আমি সুখে আছি, তুমি আকুল ধারায় ভাসিয়ে দিয়ে, ওই নগর, ওই নগর বড় তাপিত, শুষ্ক, মানুষ বড় কষ্টে আছে সেখানে।" (নির্বাসিতা)

'দানপত্র-১' গল্পটি সাধু ভাষায় লেখা। এখানে তৎসম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার গল্পের কাহিনী বয়ানকে অন্য মাত্রা দিয়েছে—

"জীবনের প্রান্তে আসিয়া আমি বৃদ্ধ সাহেব মারি বাস্কে এই দানপত্র সম্পাদন করিতেছি। আকাঙ্ক্ষা এই যে, আলোর মৃত্তিকায় দৃষ্টিপাত করিয়া এই দানপত্রে উল্লিখিত ভূমি গ্রহণের নিমিত্ত সকলে হইয়া উঠিবে সাহেবমারি।" (দানপত্র- ১)

'দানপত্র-২' গল্পের মধ্যেও সাধুভাষার পরিচয় পাওয়া যায়—

"ইদানীং মনে হয় অকূল সমুদ্রে নৌকা ভাসানো সেই মানুষ বাঁচিয়াছে। জয় করিয়াছে প্রকৃতি। হয়তো কোনওদিন আসিয়া দাবি করিবে তাহার সম্পদ। দাবিতে অন্যায়

দেখি না। অন্যায় ও দেহে নীলাম্বর বোয়ালের রক্ত। . . .নীলাম্বরের পুত্রকে ইতরজনেরা তাহাদের সন্তানবৎ দেখিত। ইহাই সত্য।" [১৫]

'দুইনারী' গল্পে অমরমিত্র রাঢ়ী উপভাষা ব্যবহার করেছেন। আসলে গল্পের প্লটে রয়েছে দামোদর সংলগ্ন বল্লভপুর, তাছাড়া বাঁকুড়া, রাণিগঞ্জ ও বর্ধমান কেন্দ্রিক মানুষের সংসারজীবন কথা। যেমন—

১. "হাঁ লো, উ বুড়া সোয়ামী লিয়ে করবি কি ?"

ন > ল, বা ল > ন— রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য।

২. "ভিখ মাগত্যা যাব কেনে ?"

পশ্চিমী রাঢ়ী উপভাষায় এ ধরনের ভাষা বৈশিষ্ট্য মেলে। [১৬]

গল্প বলার কৌশলে লেখক গল্পের সমাপ্তি অংশে লোভ-লালসা, সংকোচ, ঘৃণা, আত্মদহন ইত্যাদি অনুভূতির সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যা আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির মায়াময় নিবিড়তায় এক অপরূপ চিত্রকল্প রচিত হয়ে শিল্পের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করেছে। গল্প বয়ানের মধ্যে ধনু যখন মৃত রমণীকে ভাসিয়ে দিতে আসে তখন রচিত হয় ভাষার সাবলীলতা—

"তখন রাত গহীন। দূর পৃথিবীর কিনারা বেয়ে চাঁদ উঠে আসছিল গেরুয়াবর্ণ এক রুগ্ন শিশু। অল্পস্বল্প আলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে থৈ পাচ্ছিল না অন্ধকার। হাসফাস করছিল আলোহাওয়াহীন অন্ধ মানুষের মত এই জলমগ্ন পৃথিবীতে। বহমান স্রোতের গর্জন শোনা যায়।" (দেবী ভাসান)

আবার 'পাহাড় গোড়ায়' গল্পের মধ্যে ঝাড়খন্ডী উপভাষার ব্যবহার দেখা যায়। [১৭] যেমন—

১. "সূর্যি উঠেক নাই। মাস্টার ঘুমাইছে বটেক"—এখানে ক্রিয়া পদের 'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়।

২. "ঘর কুথাকে বটেক"—'আছ' ধাতুর পরিবর্তে 'বট' ধাতুর ব্যবহার ঘটেছে।

অমর মিত্রের গল্পের ভাষায় কাব্যময়তার সাথে সমান্তরালতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

''সেই রূপবতী নারী হাঁটছিল একটি নদীর দিকে। নদী হতে পারে তা, হ্রদ হতে পারে, হতে পারে সাগরও। সালংকারা রূপসী বরণডালার মতো কী যেন নিয়ে নিচু হয়ে জলে ভাসাচ্ছে তা।'' (শাপভ্রষ্টা)

মানব চক্রবর্তী

মানব চক্রবর্তীর গদ্য নির্মাণে নিজস্ব একটি ধরন তৈরি হয়েছে। বিষয় অনুসারে ভাষা নির্মাণে বাক্যের গঠন, শব্দচয়ন, নাটকীয়তা সৃষ্টি, উপমা প্রয়োগ, বিশেষণ ও বিশেষ্যের সমাবেশ, প্রশ্নবোধক বাক্য, আঞ্চলিক উপভাষার প্রয়োগ, ক্রিয়াপদের যথাযথ ব্যবহার ইত্যাদির মানানসই প্রয়োগে তাঁর রচনাশৈলীর শক্তি গড়ে উঠেছে।

ক) গল্পে ব্যবহৃত উপমা ও চিত্রকল্পের চমৎকারিত্ব অতিসহজেই আমাদের মুগ্ধ করে। যেমন—

১. 'তেঁতুল বিচির মত কালো দাঁত বের করে খ্যা খ্যা হাসে সংগ্রহশালার মালিক।' (মিছা)

২. 'গাছ দুটোর খুব বাড়। ফ্যারেক্স-শিহর মত মাসে মাসে বাড়ছে।' (বাড়িবিষয়ক গদ্যে মানুষ ও বৃক্ষ)

৩. 'নতুন টাকার ফড়ফড়ে ফাটিটার হাসি।' (মাছ)

৪. বাপ যেভাবে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় সেভাবেই একটা হাত মাছের পিছল শরীরে বুলিয়ে, ছেড়ে দেন জলে।' (মাছ)

খ) গল্পের সূচনা ও সমাপ্তি অংশে লেখকের আখ্যান নির্মাণের চমৎকারিত্ব ধরা পড়ে বেশ কয়েকটি গল্পে। যেমন—

১. 'বদরাগি যুগলকিশোরের ভালবাসাও লাগামছাড়া।' (পিত্তি, সূচনাংশ)

'এই মুহূর্তে তার গলা-বুক-পেট-তীব্র তিতায় ছেয়ে যাচ্ছে। তিতা...বিষ তিতা...।' (পিত্তি, সমাপ্তি অংশ)

২. 'কর্নেল রায়ের রুটিন ছকে বাঁধা।' (কর্নেলের গোলাপ চারা, সূচনাংশ)

'আমার হাত চেপে ধরে কর্নেলকাকু হু হু করে কাঁদতে লাগল।' (ঐ, সমাপ্তি অংশ)

৩. 'মানুষের পেটে রাক্ষসের বাচ্চা, দু'টাকা...দুটো মাথা, চারটে হাত, চারটে পা, দুটো লেজ...দু'টাকা।' (মিছা, সূচনাংশ)

'আজ তিলি আগে, তার ভয়ভাঙানি আলোর বিচ্ছুরণে পথ হাঁটছে ধুনি...' (ঐ, সমাপ্তি অংশ)

৪. 'কংসের কারাগারে যার জন্ম, তার নাম বাসুদেব হওনই ভাল, কি কন্ ছ্যার ?' (দাগা, সূচনাংশ)

'অদূরে ধানু, ভয়ে-তরাসে যতই বাচ্চার মুখে হাত চাপা দেয়, ততই বাসুদেব হাসে, খিলখিল...খিলখিল...' (ঐ, সমাপ্তি অংশ)

দৃষ্টান্তে প্রথম ও শেষ বাক্যবন্ধে নাটকীয়তার মাধ্যমে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের নিরিখে সচেতন ভাবে বিষয়ভাবনাকে তুলে ধরে পাঠকের অন্তরে নানান প্রশ্নের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তবে সূচনাংশেই মূল বিষয়ের বুনন জমাট করেছেন লেখক। সামগ্রিক একটি বিবরণে দেশ কাল সময় ও সমাজের ছবি তৈরি করেছেন মানব চক্রবর্তী।

গ) 'দাগা' গল্পের সূচনায় বাক্যের পর বাক্যের মধ্যে ক্রমাগত আসক্তির পরিবেশ তুলে ধরেছেন। যেমন—

> "দ্বিজপদর মেচেতা-পড়া মুখের দিকে কড়া চোখে চাইলেন বনতুলসী রক্ষিত। অন্য সময় হলে নির্ঘাত দ্বিজপদর পিঠে মোটা রুলের ঘা-কতক পড়ত।...আসামীরা বাইরে মারদাঙ্গা করে এসে, লকআপে নিশ্চিন্ত। বাড়ি থেকে মাছ ভাত আনিয়ে খায় কেউ, কেউ মুরগির মাংস। পার্টির লোক হলে তো আর কথাই নেই।"

ঘ) ছোট ছোট বাক্য বন্ধে বিষয় ভাবনার সাথে চরিত্রের কথনভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। যেমন—

১. 'আমার কৌতূহল হল। এগিয়ে এলাম। খুব ভাল করে দেখলাম। দাড়ি গোঁফের আড়াল থেকে একটা মুখ ভেসে উঠল।' (দানো)

২. 'মিনিস্টার আসবে, তাই এত তোড়জোড়। খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সাংঘাতিক লোক। একেবারে ছিঁড়ে খেয়ে নেবে। সুপারের চোখে ঘুম মেই।' (সমীপেষু)

৩. 'মাটির ধর্ম। মাটির মন। জলবায়ু। তবে না গাছ বেড়ে ওঠে।' (কর্নেলের গোলাপচারা)

৪. 'বলিষ্ঠ শরীর। চওড়া কাঁধ। মোটা গোঁফ। মাথায় টুপি। পোশাকের বুকে ঝকমকে ব্যাজ।' (ঐ)

৫. 'বিড়ি খায়। খাওয়ায়। হাসে। নতুন কি এরিয়ার পাওয়া যাবে, শোনায়।' (পিত্তি)

ঙ) প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্রমাগত ব্যবহারে ঘটনার ঘনঘটা পাঠকের মনোজগতকে সজাগ করে। সাথে সাথে উত্তরদাতার অপেক্ষায় না থেকে পাঠক এগিয়ে যায় বিষয়ের গভীরে। এই সত্যতা দেখা যায় মানব চক্রবর্তীর গল্পে। যেমন—

১. '—কি কইলা ? অভাবের লাইগ্যা তোমাকে কি আমি ল্যাংটা কইরা রাখছি ? নাকি রাইতে কোনদিন ভিজা-চিড়া খাওয়ায় রাখছি ?' (পিত্তি)

২. 'কেউ কি তার বিগত জন্মের কথা মনে রাখতে পারে ? তিলি জানে, গতজন্মে সে কি ছিল ? আদৌ মানুষ ছিল কি ? যদি তাই হয়, তবে গত জন্মের পাপ তাকে এ-জন্মেও ছেড়ে যাবে না ?' (মিছা)

৩. '— কেনে ? মিছা বইলে উয়ারা ঠকাবেক ? পয়সা লিয়ে উয়ারা মিছা বইলবেক ?' (ঐ)

৪. '— হ বুঝছি। কিয়ের ভোগ ? ইট-কাঠ চিবাইয়া খাওন যায় ? তবে ? ভোগ মানে মনের থিতু।' (বাড়ি বিষয়ক গদ্যে মানুষ ও বৃক্ষ)

৫. '— কেন ? তোর বাপ নেই ? মা নেই ? কিছু খেতে-পরতে মন চায় না ?' (বাজার)

চ) কয়েকটি গল্পের চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে এবং বক্তব্য উপস্থাপনায় লেখক স্বয়ং একটি চরিত্র হিসেবে প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ঘটনার বিন্যাস ঘটিয়েছেন। যেমন—

১. 'আমি ফক্‌রির হাত ধরে বললাম, থাক...থাক...। মনে মনে অবশ্য বললাম, ডেলি টেংরির জুস্ খাওয়া ছেলের এই দশা!' (দানো)

২. 'আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি কর্নেলকাকুর মুখের দিকে। চোখের পাতায় হালকা সবুজ পাতার থিরথিরে কাঁপন। মনে হল কর্নেল কাকুর গলাটাও যেন কাঁপছে। আমার বাবাও আমাকে এই ধরনের কথা বলে থাকে।' (কর্নেলের গোলাপচারা)

৩. 'আমার বাবা কিন্তু ভারি সুন্দর নাম দিয়েছিলেন ওই জোড়টার। পইতে নালা। বাবার মুখে পইতে— নালা শুনে আমরা অবাক। বাবা হেসে বলতেন, দ্যাখ, কতদূর থেকে এঁকেবেঁকে চলেছে,' (কামেশ্বরের বিগ্রহ)

ছ) গল্পের বয়ানে দেখা যায় বাক্যের সূচনাতেই চরিত্রের নাম নেই। আবার কখনো কয়েকটি পদের পরেই নাম ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

১. '— কী হইলো ? যাইবা না ?

— না। একলগে যামু।

— কী যে কও। আমার রাইত হইব্যা।

— হোক। একলগে যামু।

এ সময় অন্নপূর্ণাকে তার ভীষণ ভাল লাগে।' (বাড়ি বিষয়ক গদ্যে মানুষ ও বৃক্ষ)

২. 'বাবা হেসে বললেন, হয়ত এতদিনে ভুল ভেঙেছে দানোর' (দানো)

'অন্ধকারের দিকে চেয়ে দানোদা বলল, মনটা বড় দুখাইছে।' (ঐ)

'— তবে আরও দু-টুকরো মাছ দাও ওকে বাবা বললেন।' (ঐ)

৩. 'ভোর পাঁচটাতেই দরজায় ধাক্কা।

লুঙ্গির গিঁট শক্ত করতে করতে বিরক্ত বনতুলসী রক্ষিত নেমে এলেন খাট থেকে। দরজা খুলেই অবাক। সামনে মেজোবাবু।

— কী ব্যাপার ?

— কেলেংকারির কান্ড স্যার! মেয়েটা টেঁশে গেছে।

— টেঁশে গেছে ? বলেন কি!' (দাগা)

(ছ.১) ও (ছ.৩) দৃষ্টান্তে ঘটনার বর্ণনায় বক্তব্য শুরু হয়েছে ড্যাশ (—) দিয়ে। কিন্তু (ছ.২) দৃষ্টান্তে চরিত্রের নাম উল্লেখ সহ 'বলল' বা 'বললেন' শব্দ দিয়ে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে।

জ) একই জাতীয় শব্দ বা পদের পুনরুক্তিতে ধ্বনিসাম্যের সাথে পাঠকের মানসলোকে বাক্‌প্রতিমা নির্মাণ করে দেন লেখক। যেমন—

১. 'ও কি তোমার পরিচিত ? ও কি তোমার কাছে প্রায়ই আসত ? লোকটা কি তোমায় কিছু করার মতলব করেছিল ?' (দাগা)

২. '—ওমা...ওটা আবার পুকুর নাকি ? ও জল মুখে দিলে নির্ঘাৎ কলেরা হবে।' (ভার)

৩. 'না...না...না...থুতনির নিচে কাটা দাগ ছাড়া গোবিনের আর কোথাও সামান্য ছড়ে যাওয়ার দাগ নেই...' (ভয়ের পল্লী)

ঝ) অসমাপিকা ক্রিয়া সম্পন্ন দীর্ঘ বাক্য নির্মাণে লেখকের বাক্যগঠন রীতি চোখে পড়ে। যেমন—

১. 'প্রচন্ড বিরক্ত, ক্ষুব্ধ, ধ্বস্ত, বনতুলসী রক্ষিত মেজোবাবুকে বিধেয় করে ধপাস্ করে বসে পড়লেন সোফায়।' (দাগা)

২. 'জীবনের মহামূল্যবান দিনগুলি যে পূজোর নৈবেদ্য করে সাজিয়ে দিয়েছে একটা মানুষের পায়ে, অথচ সামান্য কলুষ যাকে স্পর্শ করেনি, সেবা ও ভালবাসার ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকা একটা বৃক্ষ মানুষ হাতের স্পর্শ পেল না, ফুটল আর ঝরে গেল বাতাসের ছিঁচকে দাপটে, সে এখন কোথায় যাবে তার বোধবুদ্ধিহীন ছেলেকে নিয়ে ?' (মাছ)

৩. 'হঠাৎ একদিন টের পেলাম, রাত্তিরে বিশেষ করে চাঁদের আলোয়, একা একা কামেশ্বর গাঁইতা চালায়, ঝুড়ি ভরে, মাথায় করে দূরে নিয়ে ফেলে।' (কামেশ্বরের বিগ্রহ)

ঞ) কাব্যিক ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা দেখিয়েছেন মানব চক্রবর্তী। গল্পের বহুস্থানে কাব্যভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন—

১. 'মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চুঁইয়ে পড়া জ্যোৎস্নায় ওরা ভিজতে থাকে। ওদের প্রত্যেকটা কথা বীণার তন্ত্রীতে সুর হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।' (বাড়ি বিষয়ক গদ্যে মানুষ ও বৃক্ষ)

২. 'বোতামবিহীন পাঞ্জাবির ফাঁকে চকমকে সোনার হার দোলা দিচ্ছে।' (মিছা)

৩. 'সামনের অন্ধকার ডিঙিয়ে একটু দূরেই আলোর চক্র। তার দিয়ে গোল করে ঘেরা, ঘাস চাঁছা, মেটে রঙ, জায়গাটায় বিজলি বাতির তেজালো আলো।' (ভয়ের পল্লী)

ট) ক্ষেত্র বিশেষে ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা দেখিয়েছেন। যেমন—

১. মেলার ভাষা—

''ধীরে ধীরে ওরা ফিরে এল মেলার মাঝে। ক্রমশ ভিড় কমে আসছে। নাগরদোলায় চড়ার জন্য লম্বা লাইন ছোট হয়ে এসেছে। হাঁসের গলায় চুড়ি পরানোর জন্য জুয়াড়িদের ভিড় অনেকটা স্তিমিত। কাগজের দেওয়ালে বৃত্তাকারে সাজানো ছোটছোট বেলুন বন্দুক দিয়ে ফাটানোর ফুটুস-ফুটুস শব্দটা এখন আর কানে আসছে না।'' (মিছা)

২. থানা সংক্রান্ত ভাষা—

''কত ডাকাতি মার্ডারের কিনারা করেছেন, কত ক্রিমিনাল-কে পেঁদিয়ে হাঁটুভাঙা-দ করে ছেড়েছেন, কত পকেটমার-গাঁটকাটার হাতের আঙ্গুল কুঁদো-ছেঁচা করে লুল্লা করে দিয়েছেন।'' (দাগা)

৩. হাসপাতাল সংক্রান্ত ভাষা—

''গত কদিন ধরেই দুবেলা ধোয়ামোছা চলছে হাসপাতালে। প্রতিটি হাসপাতালে সাডেন্ ভিজিট করা উচিত। চেক করা উচিত রোগীর ডায়েট। দামী ওষুধ সাধারণ মানুষ কেন পায় না।'' (সমীপেষু)

ঠ) হিন্দি শব্দের ব্যবহার রয়েছে নানান গল্পে। যেমন—

''রামলোচন সিং হেসে বলে, তু তো সন্ত য্যায়সা বাতে করতা। শালা, শোনে কা চাট্টাই নেহি, তাম্বু কা ফরমায়েশ। তিন বাচ্চা ভুখা মরতা, চৌথে কো গোদ লিয়া। হা: হা: হা:...'' (দাগা)

নলিনী বেরা

নলিনী বেরার শিল্পী সত্তায় গ্রাম তথা পল্লী প্রকৃতির চিরন্তন সচল রূপ ধরা রয়েছে। রাঢ় অঞ্চলের মানুষেরা অশিক্ষার অন্ধকারে স্থবির, অস্বাস্থ্যে ভঙ্গুর। মানুষগুলির সুখ-দুঃখের মধ্যেই ভালোবাসা, ক্রোধ, সামান্য সামর্থে অসামান্য আকাঙ্ক্ষা, লালসা, ঘৃণা, পাপ-পুণ্যি বোধ, তিক্ততা, জীবন সম্পর্কে বিপন্নতায় পৌঁছে যাওয়া কিংবা বেঁচে থেকে যন্ত্রণায় কাতর হওয়া— ইত্যাদি বিষয়-ভাবনায় চরিত্রগুলি ভাববিনিময় করে বেঁচে থাকে। নলিনী বেরার গদ্যের বয়ানে এই সব মানুষগুলি জীবন্ত হয়ে রয়েছে। লেখক নিজেও চরিত্রগুলির সাথে কথা বলেন— 'লেখার ভিতর দিয়ে সেই দ্বীপের সঙ্গে, সেইসব মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি।' তাঁর গল্পের ভাষায় অনুভবের কথা ধরা রয়েছে। আমরা কয়েকটি গল্প অবলম্বনে তাঁর ভাষারীতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি—

ক) "— বলি মাছ, ধরবা তো ?

— হঁ, নিশ্চয়। মাছ না ধরলে খামু কি ?

— মাঝ রাত্তিরে ডাকি যদি আসবা তো ?

— হঁ, আসমু বইকি।

— 'না,' তাই কইছিলাম— মুই ডাকমু আর তুমি যা ঘুমকাতুরে।" (ভূত জ্যোৎস্না)

খ) "— ক্যানে ডিম ফুটোয়ে বাচ্চা করি পুষম্" (ভূত জ্যোৎস্না)

— এই দুটি উদাহরণেই বঙ্গালী উপভাষার যে যে বৈশিষ্ট্য আছে তা হল :

১. বঙ্গালী উপভাষায় ভবিষ্যৎ কালের মধ্যম পুরুষের বিভক্তি 'বা' হয়। [১৮] যেমন— আসবা, ধরবা।

২. বঙ্গালীতে ভবিষ্যৎকালের উত্তমপুরুষে 'ম' বা 'মু' বিভক্তি হয়। যেমন— খামু, আসুম, ডাকুম্।

৩. রাত্তি < রাত্রি— অর্ধতৎসম শব্দ

৪. বঙ্গালী উপভাষাতে সংবৃত 'এ' বিবৃত 'এ্যা' তে পরিণত হয়। যেমন— কেন > ক্যান।

গ) নলিনী বেরার গল্পকথায় প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্ক দেখা যায়। দু'একটি উদাহরণে এই বক্তব্য স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হবে।

১. "বউ নিয়ে গাঁয়ে যাচ্ছি। পায়ে হেঁটেই নদীটা পেরুলাম। শীত আর নেই। জল হাঁটুর নিচে নেমে আছে। অপর্ণা বলল, এই তোমাদের নদী! একে নিয়েই

এ্যাত-অ!" (যৌতূক)

২. "বিকেল আর কিছুতেই ফুরোতে চায় না। দাওয়ায় বসে রাস্তার দিকে চেয়ে আছি। লোকজন যাচ্ছে-আসছে। মেয়েরা বলসি কাঁখে কুঁয়ো থেকে জল নিচ্ছে। আগে আগে যখন গোঁফে চুলের রেখা সবে দেখা যাচ্ছিল, তখন এই দাওয়ায় বসে মেয়েদের দেখতাম।" (হাঁসচরা)

এমন স্বচ্ছন্দ গদ্য শৈলীর রূপকার নলিনী বেরা। পাঠককে হাত ধরে প্রতিটি বিবরণের সাথে যেন জড়িয়ে দেন, মোহগ্রস্ত করে বসিয়ে রাখেন গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

ঘ) 'মাছরাঁকা' গল্পের বয়ানে দেশীয় শব্দের নিপুণ ব্যবহারে লেখকের আঞ্চলিক ভাষা জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় স্পষ্ট ধরা পড়ে—

"তলদেশে যা থাকে একটা পুকুরের সে-সব আছে। এই যেমন পাঁক, পাঁকাল মাটি, কেঁচো, গেঁড়ি-গুগলি, শামুক, ঢোঁড়া সাপ, জলঘুন্নি, পোকা মাছ, টুটুরি ব্যাঙ, ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়, চুড়ি ভাঙা, নুনুড়ি পাথর, জল কলমী, ভালবাসা, হত্যা-আত্মহত্যা, ঘুনসী, নিম সাবানের কাগজ-খোপ, জল-উদ্ভিদ ঘুঙুর, কাঁচভাঙা, সাপের খোলস, আঙরা, বাঁশকাটা, পাতা, চাঁদ-সূর্য, খড়ের মানুষ, ফেতি, কাঁকড়া, লুবু কাঁকড়া, জল, জলের লেয়ার, শশধর দঁড়পাট ইত্যাদি।" [১৯]

অতি যত্নে সাজানো শব্দগুলি লেখকের চিন্তাপ্রসূত নয়, এগুলির প্রত্যক্ষতাই লেখককে বাস্তবনিষ্ঠ করেছে। গদ্যের ছন্দ যেন আশ্চর্যভাবে কাব্যিক না হয়ে সুষমাময় চাতুর্যে প্লটের বিন্যাসকে গড়ে তোলে। এই শৈলীতে যেন একটি বাক্‌প্রতিমা চমৎকারভাবে উজ্জ্বল রূপে ধরা দেয়। প্রাণবন্ত রূপে প্রতিটি শব্দ কথা তাকিয়ে থাকে। আর তাঁর সৃজনশীলতার গুণে পার্থিব জগৎ যেন জীবন্ত মূর্তিতে প্রতিবিম্বিত হয়। এজন্য তিনি একজন বড় শিল্পী।

ঙ) নলিনী বেরার মানসলোকে নদী ও জলের বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা আছে। লেখকের স্মৃতি মেদুরতায় নদী, খাল, জলাভূমি ও জলের বিবরণ ধরা পড়ে। রূপ ও স্বরূপের ভিন্ন বয়ানে গল্পের মধ্যে জলের প্রসঙ্গ ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে—

"মাঝে মাঝে খালের থম-মারা জলে হড়বড়িয়ে নেমে গিয়ে আজলায় ফেনা-ফেনা জল তুলে কি যেন পরীক্ষা করে দেখছিল কংসহরি। তার নিজের 'চার-গোড়িয়া' জাল নেই, তাই সরিন্দরকে অনুরোধ করে বলছিল, 'মাঝরাতের দিকে এইঠে এই খাল-মুহে চার-গোড়িয়া জাল ফ্যাললে খুব ভুসাচিংড়ি, সরপুঁটি আর মৌরলা ধরা পড়বে সরিন্দর, কি বুঝলা ?" (ভূতজ্যোৎস্না)

চ) পথের প্রসঙ্গে ভাষা নির্মাণ যেন তাত্ত্বিকতায় পৌঁছে গেছে। রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী নাটকে 'পথ' একটি দৃশ্যের নাম ছিল। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর 'পথ' জীবন পারের সংযোগের সূত্র স্বরূপ। আর নলিনী বেরার গল্পে পথের সংযোগ যেন গ্রামের সাথে শহরের, অশিক্ষিতের সাথে শিক্ষিতের,

অনালোকিত অংশের সাথে আলোকিত অংশের মেলবন্ধন স্বরূপ। গ্রামীণ মেঠোপথ, দূর্বাঘাস, শিশিরের বিন্দু— এসব যেন পরম স্নেহের প্রিয়জন, বাঁচার শক্তি, ভালোলাগার পরশমণি। গল্পকার চাঁদের আলোয় গ্রামের ছবি এঁকেছেন মোহময়ী ভাষায় 'ভূতজ্যোৎস্না' গল্পে—

> "ধূৎ পথ কখনো শেষ হয়। শেষ হয় না, ফুরোয় না। অনন্ত পথ, অনন্ত তার চলা। লোকালয় ফুরিয়ে যায়, অমুক নামধেয় গ্রামটির সীমা-পরিসীমা শেষ হয়, পথের পাঁচালিও সমাপ্ত হয়। পথ তবু চলতেই থাকে। চলতেই থাকে।" [২০]

— এই পথের শেষ নেই। কিংবা পথের শেষে কি রয়েছে তার অনুসন্ধানেই আরো পথ চলা। লেখক অনন্ত পথের অন্বেষণে রত। তাই বলেন—

> "দিন রাত্রি পার হয়ে জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়...তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভরে আসে, পথ আমার তখনও ফুলায় না...চলে...চলে...এগিয়েই চলে...।" (ভূতজ্যোৎস্না)

ভাষাকাব্যময় হয়ে ভিন্নমাত্রায় পৌঁছে গেছে।

ছ) ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা নলিনী বেরা দেখিয়েছেন। যেমন—

> "আওয়ার লাইফ হ্যাজ নো ফিউচার। ইট ইজ এ সিরিজ অব প্রেজেন্ট মোমেন্টস— গাঁজাখোরি থোও সরিন্দর!" (ভূতজ্যোৎস্না)

সৈকত রক্ষিত

গল্পের বয়ানে ভাষার ভূমিকা যথেষ্ট কার্যকরী। ভাষার রীতির সাথেই গল্পের কাহিনির চলন নির্ভরশীল। গল্পকার একটি বিবৃতিমূলক ভাষা ও অন্যটি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মুখের ভাষার মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। সৈকত রক্ষিত পুরুলিয়ার লোকভাষাকে গল্পের বয়ানে তুলে ধরেছেন। আদিবাসী ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন কথা গদ্যের রীতিতে শব্দ কৌশলে প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে তাঁর রচনায়। রাঢ়বঙ্গের প্রাকৃতিক পরিমন্ডলে তার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মুখের ভাষায় সামাজিক ইতিহাস, সুখ-দুঃখ, প্রথা-সংস্কার, রীতি-নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাক্যগঠনের পারম্পর্য রক্ষার জন্য কাহিনির মধ্যে ঘটনা ক্রমশ এগিয়ে চলে। এই কৌশলটি লেখকের নিজস্ব। শিক্ষিত নাগরিক সমাজের মানুষ হিসেবে চলিত গদ্যের সংলাপে গল্পের মধ্যে অন্যান্য চরিত্রের মনোভাব ও পরিস্থিতির পরিচয় বিবৃত করেন গল্পকার। তাছাড়া চরিত্রগুলি নিজেদের আঞ্চলিক (পুরুলিয়া সংলগ্ন) ভাষায় পরস্পরের মধ্যে বাক্য বিনিময় করেছে। আমাদের আলোচনায় দৃষ্টান্তের মধ্যে তা প্রতীয়মান হবে।

১) গল্পের সূচনা ও সমাপ্তি অংশে চলিত গদ্যের সংলাপ লেখকের নিজস্ব বাচন ভঙ্গির পরিচয় দেয়। যেমন—

ক. ''মানুষের প্রতি গুহিরামের কোনো রাগ নেই। তার যত রাগ-রোষ সবই প্রকৃতির প্রতি। যখন অত্যধিক গরম আর পিঠফাটা রোদে পাকদন্ডীতেও পা ফেলা যায় না, পিচের রাস্তাগুলো গলতে শুরু করে তখন মাইল মাইল পথ হাঁটতে না পারায় তার বড় বেশি নিরুপায় মনে হয় নিজেকে।'' (পট, প্রথমাংশ)

''পাথরে হোঁচট খেয়ে দন্ডী দেওয়ার ভঙ্গিতে পড়ে যায়! চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে গাঁট-বাঁধা চাল। গড়িয়ে যায় থালাটিও। তার কোমর থেকে খসে পড়া কাগজগুলো বাতাসে উড়ে যায়। গুহিরাম পড়েই থাকে।'' (পট, সমাপ্তি অংশ)

খ. ''গোবিন্দ মুচির ঘর বলতে ছোটোখাটো একটা ঝুপড়ি মতন। খড়ের নিচু চালা। তার একাংশ জরাজীর্ণ। সেখানকার বাঁশ-বাতাগুলো বেরিয়ে পড়েছে খড়ের অভাবে।'' (হাম্বা, সূচনাংশ)

'পিছনে পিছনে হারাধন। গ্রামের পথ ধরে ছুটতে থাকে বাপ-ব্যাটা।' (হাম্বা, সমাপ্তি অংশ)

গ. ''বেলা বাড়ছে চড়চড় করে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোদের তেজ। বর্ষা প্রায় শেষ হতে চলল অথচ বৃষ্টি নেই।'' (খরা, সূচনাংশ)

''খা খা গ্রামটার দিকে তাকিয়ে থাকে পল্টন। প্রকান্ড শূন্যতায়, এই প্রথম, চোখ তার ছলছল

করে!'' (খরা, সমাপ্তি অংশ)

দৃষ্টান্তে তিনটি গল্পের সূচনা ও সমাপ্তি অংশে চলিত গদ্যের বয়ানে লেখকের কথন ভঙ্গিটি ধরা রয়েছে যা লেখকের বর্ণনা শক্তির পরিচয়টি প্রকাশিত হয়েছে।

২) কাব্যময় ভাষায় প্রকৃতির সাথে গল্পকারের নিবিড় সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে নানান গল্পে। যেমন—

ক. ''পথেই নেমে আসে অন্ধকার। কিন্তু এখন ক্ষুধা ঈষৎ নিবৃত্ত হওয়ায় ঘরে ফেরার তেমন তাড়া নেই। সবার আগে আগে মাগারাম। মাথায় বিশাল বস্তার বোঝাটা নিয়ে। ডান হাতে আঁকশি দোলাতে দোলাতে এগিয়ে চলে।'' (আঁকশি)

খ. ''সারারাত্তির বাতাস থাকে ভারী। মিহি ধূলোর মতো শিশির পরতে পরতে জমতে থাকে আখের খেতগুলিতে। সেই শিশিরে খেতের মাটি ভেজার আগে ভিজে যায় গাছগুলি ও পাতাগুলি।'' (মাড়াইকল)

গ. ''পাঁক উঠতে উঠতে শুধু পাঁকই উঠে যায়। একটু একটু করে দিনের লাবণ্য কেটে গিয়ে পাঁকের মতোই বিবর্ণ হয়ে আসে বেলা। এক সময় খড়ু ফিরে পায় তার ঘটি।'' (খরা)

দৃষ্টান্তে ভাষা কাব্যময়তার সাথে ব্যঞ্জনাগর্ভের পরিচয়ে লেখকের সৃষ্টি কৌশলকে উৎকর্ষের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। আর তৈরি হয়েছে লেখকের চিত্রকল্পের উজ্জ্বলতা।

৩) গল্পের সংলাপে দীর্ঘ বাক্য ও খর্ব বাক্য চরিত্রের ভাব ও ভঙ্গিকে পরিস্থিতি অনুসারে তুলে ধরে। সৈকত রক্ষিতের গল্পে সব ধরনের বাক্যবন্ধের সমাবেশ রয়েছে। যেমন—

দীর্ঘবাক্য :

ক. ''আমড়ুর খেতে যেভাবে হামাগুড়ি গিয়ে শবর-শিশু, শীত শেষের মাঠগুলোতে যেভাবে জেগে উঠছে সরষের ফুল— আকাশ তেমনি বর্ণময় জেগে থাকে এখানে।'' (দাহভূমি)

খ. ''হয়তো, দলবদ্ধভাবে নদীতে সোনা ধুতে এসেও তারা কোনোদিন দেখতে পাবে— টর্চ কো নদীতে জল খেতে এসে, মানুষের পায়ে মাটি ধসকানোর শব্দ পেয়ে, গাছ-পাতের আড়ালে ঢুকে যাচছে একটি লাকড়া।'' (দাহভূমি)

গ. ''সকাল থেকে শুরু করে যতক্ষণ দিনের আলো থাকে, রঙে চুবানো কানির মতো মাটির দেওয়ালে পড়ে থাকে রোদ, ততক্ষণ ওরা মুখোশ বানিয়েই চলে।'' (মুখোশ)

আবার একদম ছোট বাক্যও ব্যবহার করেছেন। যেমন—

ক) 'জল আনা। জ্বালানি সংগ্রহ করা।' (ধমন)

খ) রাস্তাও তো অনেকটা। সতেরো কিলোমিটার। (দাহভূমি)

গ) গায়ে সেই ছেঁড়া গেঞ্জি। ঠেঁটি লুঙ্গি। (পট)

৪) ছোট ছোট বাক্যবন্ধ ক্রিয়াপদহীন হওয়ায় যথেষ্ট ভাব যতি সম্পন্ন হয়েছে। যেমন—

ক) 'দুঃসাহসিনী নারী।' (বাঁজা)

খ) 'কলাপতির জঙ্গল।' (শবরচরিত)

গ) 'দু-হাত বেড়ের সরু কুয়ো।' (খরা)

৫) আধুনিক কবিতার মতো ক্রিয়াপদ আগে ব্যবহৃত হয়েছে অনেক বাক্যে। এই ধরনের বাক্যগঠন রীতির ফলে কাব্যময়তায় মোড়া থাকে সংলাপের ভাবনা। যা সৈকত রক্ষিতের গল্পে পাওয়া যায়। যেমন—

ক) 'সেখানে আছে নদী।' (মুখোশ)

খ) 'এক সময় খড়ু ফিরে পায় তার ঘটি।' (খরা)

গ) 'হাঁটতে হাঁটতে পা ঝাড়ে লখা।' (খরা)

ঘ) 'বেজে ওঠে ধামসা-মাদল।' (বয়ার কাড়া)

ঙ) 'বাইরে বেড়ে চলেছে রোদের তাপ।' (মুলুক)

৬) ছোট ছোট বাক্য বন্ধে প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্রম দেখা যায়। চরিত্রের চাওয়া পাওয়া ও অজানা মনোভাবের বিশ্লেষণ প্রশ্নাকারে পর পর চলে এসেছে। যেমন—

ক. 'হামার ? নাম ? মাগারাম।' (আঁকশি)

খ. 'লিজের কথা ভাব ? তুমি মালটা বিকতে খুঁজছ ক্যানে ? ইটা বিকে একটা দু-দাঁত কিনবে। বঠে কি নাই ?' (পাঘা)

গ. 'হামি আর কৎদিন বাঁচব, হ্যাঁ কুঞ্জুখুড়া ? বাঁচব হামি ?' (মাড়াইকল)

ঘ. 'বলে, কে বঠিস তুঁই ? কিসকে আইসেছিস ? কী মাঙতে ?' (পট)

ঙ. 'হ্যাঁ ব্যাটা, ভোখ নাই লাগে ? নাই খাবি ?' (মুখোশ)

দৃষ্টান্তে দুই বা তার অধিক ক্রমানুসারে প্রশ্নবোধক বাক্য প্রয়োগে পরস্পর বাক্য বিনিময়ের সংযোগ সূত্র তরান্বিত হয়েছে। ফলে কৌতূহলী শ্রোতা ও কথক ঘটনার বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন হবার বিন্দুমাত্র সময় পায় না। এই পরম্পরার সুদক্ষ শিল্পী-মানস বাঁচিয়ে চলেছেন সৈকত রক্ষিত তাঁর গল্পের ভাষাশৈলীতে।

৭) বাক্যের পদ হিসেবে বিশেষণের প্রয়োগ যেমন থাকে তেমনি একাধিক বিশেষণ পদের প্রয়োগের মাধ্যমে শিল্পীর ভাষা ব্যবহারের কৌশল ধরা থাকে। সৈকত রক্ষিতের গল্পে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন—

বিশেষণের সমান্তরাল প্যাটার্ন—

ক. 'এমন সুন্দর লাজুক এবং অন্তর্নিহিত আবেদন সর্বস্ব' (বাঁজা)

খ. 'নিরীহ, নিষ্পাপ, গোবেচারি বালিকা' (বাঁজা)

গ. 'তার শ্রমে-দারিদ্র্যে, হতাশায় ক্লান্তিতেও অবিচল সঙ্গ দিয়ে এসেছে।' (রাঙামাটি)

ঘ. 'আর সে চালাক, সুবিধাভোগীও।' (খাদান)

ঙ. 'তেমনি আবার কঠোর সহনশীলতায় তাকে ঠেলে দেয়।' (খরা)

চ. 'একজন অবস্থাপন্ন স্বচ্ছল মানুষের পাশাপাশি এক অভুক্ত ক্ষুধার্ত মানুষের চিত্র বড়োই করুণ।' (আঁকশি)

৮) বিশেষণ প্রয়োগের বিপ্রতীপ প্যাটার্ন লেখকের গদ্যে দেখা যায়। যেমন—

ক. 'গাম্ভীর্য নিয়ে এপাশ-ওপাশ থুতনি নাড়ে। গলার স্বর নরম করে বলে' (উঠো রে পুতা জাগো রে পুতা)

খ. 'গোবিন্দর অজান্তেই, তার চেপে রাখা আনন্দ চোখের জল হয়ে এখন শুধু গড়িয়ে পড়ার অপেক্ষায়।' (হাম্বা)

গ. 'শুকনো চোখ মুহূর্তের মধ্যে ছলছল করে ওঠে।' (পট)

৯) শব্দ বা পদের পুনরুক্তিতে গদ্যের মধ্যে ধ্বনি ঝংকার তৈরি হয় এবং অধিবাচন (discouse)-এর বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বজায় থাকে। এমনকি বিবরণ ধর্মী অধিবাচনে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন উক্তির মধ্যে সংলগ্নতা গড়ে ওঠে। অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে পদগুচ্ছের পরম্পরা সৃষ্টির মধ্যে একটি প্যাটার্ন তৈরি করেন লেখক। সৈকত রক্ষিতের গল্পেও তার ব্যতিক্রম শৈলী নেই। যেমন—

ক. ''পেচ্ছাব আর গোবরের গন্ধ, ভেড়ার বাতকম্ম আর ছাগলের লোমের গন্ধ, আর ডি-ডিহাতের বহু মানুষের গায়ের গন্ধ, ঘামের গন্ধ, বুক পকেটে রাখা ভেজা নোটের গন্ধ ছাপিয়ে,'' (পাঘা)

খ. ''দেখি যাঁইয়ে তবে। কী নাম বললে, ভদু গরাই ?

ভদু লয়। ভকু ভকু।

অ। ভকু গরাই— ।'' (আঁকশি)

দৃষ্টান্তে 'গন্ধ' ও 'ভদু', 'ভকু'র পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে বক্তব্যের সারমর্ম ও যৌক্তিকতা স্পষ্টতর হয়েছে পরস্পর কথকের মধ্যে। আর কাহিনি বয়ানে সংযোগ রক্ষিত হয়েছে।

১০) বর্ণনাধর্মী বাক্যগুলির মধ্যে লেখক স্বয়ং চরিত্র হয়ে গেছেন এবং তাঁর জীবনদৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে ঘটনা ও চরিত্রের শ্রেণি অবস্থান, সমস্যা, স্বভাব ও স্বাভাবিক জীবনকথার মধ্যে। যেখানে চরিত্রগুলির মানসিক অবস্থার সাথে লেখকের মানসিকতা মিলে গিয়ে চরিত্রগুলি লেখকের মানস সন্তান হয়ে গেছে। আর স্থানিক অবস্থানে বসবাসকারী চরিত্রগুলি রাঢ়বঙ্গের প্রেক্ষাপট ছাড়িয়ে সমগ্র ভারতের সমস্যাময় দারিদ্র্যপীড়িত সাধারণ মানুষের জীবনকথার প্রতিনিধি হয়েছে। সৈকত রক্ষিতের গল্পে আমরা চরিত্রের মানসিক অবস্থার পরিচয় পাই। আর বর্ণনার গুণে প্রত্যক্ষ হয় লেখকের জীবনদৃষ্টি—

ক. ''তেমন কোনো পারিবারিক জীবন চেপুলালের নেই। যদিও তার পরিবার আছে। সেই

পরিবারের সঙ্গে তার মিলন ঘটে কেবল দড়ির খাটেই। তারপরও, পুরা দিনের ভেতরে, বউয়ের সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ যে ঘটে না তা নয়।'' (মাড়াইকল)

খ. ''এমন কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে, দোকানিদের প্রতি কোনো আক্রোশ থাকে না মাগারামের। বঞ্চনার চিরন্তন রীতি টের পেয়েও ক্ষুধার্ত মানুষের সর্বশেষ আক্রোশ নিয়ে হামলে ওঠার পথ সে অনুধাবন করতে পারে না। বরঞ্চ, এটাকেই আস্তে আস্তে সে ভেবে নিয়েছে প্রথা। নিয়তি। একদল জোগান দিয়ে যাবে, আরেক দল তার মুনাফা লুটবে।'' (আঁকশি)

গ) ''তাদের প্রতিটি উদ্ধত আঘাতের মধ্য দিয়ে তারা যেন ভাঙতে চেয়েছিল নিজস্ব অচলায়তনকে, তাদের জীবনের সীমাবদ্ধতাকে। সে প্রয়াস আজও অক্ষুণ্ণ। অদৃষ্টকে খন্ডন করার সে সাধন এখনও অব্যাহত।'' (খাদান)

ঘ) ''এই নেশার ঘোরে সে প্রতিদিন মরামাটির তালকে জ্যান্ত করে তুলেছে। তাতে চোখ ফোটাচ্ছে। খড়ি দিয়ে রং দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে তার ভেতরকার ভাষাকে। এই সৃষ্টি এই উজ্জীবনই শিল্পীর আমৃত্যু মোহবন্ধন। আজও যেখানে বসে সে কাজ করে যাচ্ছে, সেখানে বসেছে তার সাতুপুরুষ। তারাও ছিল অভুক্ত। ভীমার মতো। তাদেরও গায়ে কাপড় জোটেনি।'' (মুখোশ)

দৃষ্টান্তগুলির বিষয়ভাবনা ও চরিত্রের সমস্যাগত অবস্থানে লেখকের উপস্থিতি তথা জীবনদৃষ্টির পরিচয় বোঝা যায়। চরিত্রের ভালোমন্দের সাথে সুখ-দুঃখের শরিক হয়ে সমস্ত পরিস্থিতির সাক্ষী থেকেছেন লেখক। তাই ভাষারীতিতে ক্রিয়ার কাল অতীত থেকে নিত্যবর্তমানে ঘটনাকে বহন করে চলছে।

১১) একটি বিশেষ অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে লেখকের জীবনদৃষ্টি ও সেই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের হৃদয় কথাকে লেখক ব্যক্ত করেন। সৈকত রক্ষিতের গল্পে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। যা পুরুলিয়ার আঞ্চলিক উপভাষা হিসেবে পরিচিত। যেমন—

ক. 'ঠিকেই ত বলছে ? মানুষকে দেখে লাকড়া কখনো পালায় ? মুটুক বলে, 'উটা শিয়াল ছিল। লদীকে পানি খাতে আইসেছিল।' (দাহভূমি)

খ. ''কন্ আঁটকুড়ির বিটি হামার গাইকে খালি গো! ব্যাটার মাস খাবি। ভাতারের মাস খাবি! হামকে ইবেলা-উবেলা দু'সের দুধ কে দিবেক গোওওও।'' (রাঙামাটি)

গ. ''ডিংলি বলে, হামদের বিটি এখন হামদের ঘরে থাকবেক। হামরা উয়াকা লাড়াচাড়া করব, স্যাবা যত্ন করে ভালোমন্দ ইটা-উটা খাওয়াব।'' (আরেক আরম্ভ)

১২) গল্পের মধ্যে ঘটনার ক্রমিক পরম্পরা বোঝানোর জন্য অনুচ্ছেদের শেষে পূর্ব ব্যক্তি বা ভাবনার বিশ্লেষণের ইতি টানেন কিংবা বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে চরিত্রটি। আর ঠিক পরের অনুচ্ছেদের শুরুতে সেই চরিত্রের বা বিষয়ভাবনার সংযোগ রক্ষিত হয়। লেখক সৈকত রক্ষিত দুটি অনুচ্ছেদের মধ্যে সংযোগের জন্য পরবর্তী অনুচ্ছেদের শুরুতে অব্যয় পদের ব্যবহার

এনে দুটি ঘটনা বা দুটি অনুচ্ছেদের সংযোগ বজায় রেখেছেন তাঁর ভাষাশৈলীতে। আর এই দৃষ্টান্ত তার গল্পের ভাষারীতিকে যথেষ্ট ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত করেছে। যেমন—

ক. 'আঁকশি' গল্পে অনুচ্ছেদের

ক্রমিক সংখ্যা	অনুচ্ছেদের শুরুতে অব্যয়ধর্মী সংযোগকারী শব্দ
১০	আর
১১	কিন্তু
১৩	তবে
১৪	তবু

খ. তেমনি 'পাঘা' গল্পে রয়েছে— আর, তবে, তবু, কিন্তু, আর, অথচ, ইত্যাদি অব্যয়ধর্মী শব্দের ব্যবহার।

গ. 'মাড়াই কল' গল্পে রয়েছে— কিন্তু, অথচ, আর, শব্দের ব্যবহার।

ঘ. 'মুখোশ' গল্পে রয়েছে— কিন্তু-৩ বার, আর-২ বার, কী, কেন, আহা ইত্যাদি অব্যয়ধর্মী শব্দ।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবন বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। সেই সমৃদ্ধময় জীবন নির্ভর সাহিত্য চর্চায় গদ্যের এক বর্ণময় জগৎ সৃষ্টি করেছেন। বিষয় বৈচিত্র্যের সাথে ফর্ম নিয়ে তাঁর গল্পে পরীক্ষা করেছেন নানাভাবে। একজন বিশুদ্ধ রচনাকারের সমস্ত দুর্লভ বিশিষ্টতারই চরম শিল্পীগুণ তাঁর লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ইত্যাদি জেলার প্রত্যন্ত এলাকার গ্রাম্য মানুষের অতি সাধারণ জীবনকথার বর্ণময় ছবির রূপকার রামকুমার। তাই ভাষার আভিজাত্য ভেঙে অনেক সময় লোকভাষার মাধ্যমে গদ্যের বয়ান সাজিয়েছেন। অনেক সময় শব্দ ও বাক্যের মধ্যে অনুচ্চারিত ভাবনায় পাঠকের মনোভূমিকে জাগিয়ে রাখেন।

রামকুমার মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মে দু'চোখ ভরে দেখেছেন, জেনেছেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সময়ের পরিবর্তনে দেখেছেন— কংগ্রেসি শাসনের পরে বামপন্থীদের ক্ষমতা দখল, নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থা, এ রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, ভূমি সংস্কার। আবার বামপন্থীদের রাজ্যশাসন ও তার চ্যুতি।— এইসব উত্থান পতনের নানান সমস্যায় তাঁর কলমে নানান গল্প সৃষ্টি হয়েছে। বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবন কথা তথা আটপৌরে মানুষের হৃদয় সংবাদ দাতা রামকুমার। নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষতাকে মর্যাদা দেন বলেই তাঁর গল্পের পাঠক মগ্নতায় মুগ্ধ থাকে। তাছাড়া কথক বা ন্যারেটরের ভঙ্গিতে গল্পকে পাঠকের মনোরাজ্যে পৌঁছে দেন লেখক। প্রতিটি গল্পের মধ্যেই উপলব্ধির নতুন আবহ সৃষ্টি করেন। তাঁর ভাষায়, লোকউপাদান ব্যবহারের কৌশল, গ্রামীণ জীবন সম্পৃক্ত আচার আচরণ, বিশ্বাস আটপৌরে হলেও কাব্যময়তায় সুদূর প্রসারী বৈশিষ্ট্যবাহী, যা একটি স্বতন্ত্র নিয়মে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যায়।

'বনমালীর পৃথিবীতে ফেরা' গল্পের বনমালী দুদিন কাজ না জোটায় জীবনে প্রথম তালগাছে ওঠার দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তালগাছে ওঠার পুঙ্খানুপুঙ্ক্ষ বর্ণনায় বনমালীর বাঁচার স্বাদ ও মরণের ইচ্ছা প্রকাশে লেখক যথেষ্ট যত্নশীল। দুই বিপ্রতীপ স্রোত। অর্থাৎ জীবন ও মরণের দ্বন্দ্বে বনমালী জীবনের বিতৃষ্ণায় দেখেছে গভীর রাতে তার বউ-এর কুকীর্তি— 'কিষ্ট চৌকিদার দিব্যি তার বৌকে রাধা করে শুয়ে আছে।' ভাষা ব্যবহারের এই অসামান্য মোচড়ে লেখক আমাদের জানিয়েছেন বনমালীর উপলব্ধির কথা—

> "জীবনটাতে ঘেন্না ধরে গেছে এসব সাতপাঁচ দেখে। বাঁচতে গেলে মরতেই হয়। মাথা নিচু করে হাত দুটো ছেড়ে দিলেই সব কিছু থেকে মুক্তি।" [২১]

তালগাছের উপর থেকে বনমালীর চেনা পৃথিবী একেবারে অচেনা হয়ে যায়— নিচের পৃথিবীটা

মায়াময় পুতুলের সংসারের মতো তার কাছে। তাই সে আবার উঠতে চায় গাছের উপরে—

> "হয় নতুনভাবে জগৎটাকে দেখতে কিংবা গাছ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুরনো জগৎ থেকে নিষ্কৃতি পেতে।" [২২]

কিন্তু জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রামকুমার জিতিয়ে দিয়েছেন জীবনকেই— বনমালীকে কর্তব্য— কর্মে নিয়োগ করে।

তাঁর গল্পের কথক সর্বজ্ঞ হয়ে সর্বত্র আনাগোনা করে পাঠকের মনে ক্রিয়াশীল হয়। বিভিন্ন স্থানে কালে কথক উপস্থিত হয় পর্যবেক্ষক ও প্রতিবেদক রূপে। লেখক যেন কাহিনি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন, আর নিরাসক্ত কথকের ভঙ্গিতে বিষয়ে ভর করে এগিয়ে চলেন। কালগত উপস্থাপনায় বিরতির ফলে পাঠকের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, এক নৈব্যক্তিকতা গড়ে ওঠে স্থায়িত্বকালের মধ্যে। বক্তব্যে পুনরাবৃত্তির ফলে পাঁচালির মতো বারবার ফিরে আসে অন্তরভাবনা, যা লোকায়ত রূপের মাধ্যমে আঞ্চলিকতায় মর্যাদা পায়। স্বরগ্রামের বৈশিষ্ট্যে যথেষ্ট যত্নবান রামকুমার। একটু নিচু স্বর থেকে কথক, বিষয় ও শ্রোতার সম্পর্কের চলনটি শুরু হয়ে ধীর লয়ে এগিয়ে যায় একটি যত্নশীল অতি স্বাভাবিক অনুকম্পাবোধের বেষ্টনীতে।

তাঁর অনেক গল্পের পাঠকৃতিতে নির্দিষ্ট আরম্ভ বা সমাপ্তি থাকে না। 'শাঁখা' গল্পের শুরুতে দেবী সায়ের ও অমূল্য শাঁখারি সংক্রান্ত কিংবদন্তির মধ্যে বাস্তব ও কল্পনার সীমা মুছে যাওয়াতে পাঠকৃতির সূচনা হলেও ক্রমশ অমূল্যের উত্তমপুরুষ শুভ্রের উপস্থাপনায় বাস্তবতার রং বদল প্রকাশ পায়। গল্প প্রতিষ্ঠার প্রধান ও প্রাথমিক শর্ত হিসেবে ভাষার প্রাকৃতায়ন যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তেমনি সময়ের রূপান্তরে সম্পৃক্ত হয়েছে ভাষার ব্যবহার। তিনি বাচনের ঈশারায় গল্পত্বকে ঘনীভূত করে তোলেন বলেই বিশদ বিবরণে যাননি। নিজস্ব ভাষায় সামাজিক সত্যকে ব্যক্ত করেছেন—

> "ভারতবর্ষ একটি গ্রাম ভিত্তিক দেশ। গ্রামের অবস্থার উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি ঘটবে না। শুভ্র-এ গাঁয়ের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কান্ডারী। প্রকৃতি-প্রেমিকও।" (শাঁখা)

কিংবা—

> "রাসমঞ্চের অন্ধকারে ক্ষুদিরাম চৌধুরীর মেয়ে ছন্দার জঠরে নতুন প্রাণের আবাহন ঘটে। উৎসবে প্রাণের মরা গাঙে বান আনে।...উৎসব মানে প্রাণের অভিষেক।" (শাঁখা)

বাস্তব সত্য আসলে চিরন্তন সত্যে উপনীত হয়।

গল্প বলার ধরণে পাঠক যেন এগিয়ে যায় লেখকের ঠিক পরেই। সময় যেন তরতর করে এগিয়ে চলে ঘটনাকে সম্বল করে—

> "আগুন ঝলসে ওঠে। ঘরে ঢোকে সতুর মা। গলা কাঠ। কলসিতে এক ঘটি জল। গলায় ঢালে অর্ধেকটা। বুকের ভেতরটা হাপরের মতো হাঁসফাস করে। নামানো ঘটি

আবার তোলে। শেষ হয়ে যায় এক নিশ্বাসেই। সবটুকু শেষ।" (জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, ঘুঘু কিংবা মানুষ)

এরূপ একাধিক বিবরণী কথা যেন মন ছুঁয়ে যায়। ঘটনাকে ভাষার বন্ধনে বাঁচিয়ে রাখেন—

"আস্তে আস্তে সূর্য ডোবে। সন্ধ্যে নামে। রাত বাড়ে। দূরে মাঠের আল দিয়ে লোকজন হইহই করতে করতে চলে। আজ কেতন-কিয়ারির মেলা। এগিয়ে যায় মানুষগুলো আলপথ ধরে। মাদলের শব্দ আসে, বাঁশিতে সুর ওঠে।" (জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, ঘুঘু কিংবা মানুষ)

বর্ণনার ঘনঘটায় তরতরিয়ে এগিয়ে চলে গল্পের চরিত্রেরা—

"মাঠ পার হয় সন্ন্যাসী। বাঁয়ে চক্রবর্তীদের ঘর ফেলে রেখে ডাইনে বাঁকে। আর খানিক এগিয়ে দত্তদের ধানকল। সেটা ছাড়াতে উমেশ পালের ছেলের মুদি দোকান। আর খানিক এগিয়ে কামারপাড়া। পাড়াটা পেরিয়ে বাঁয়ে রাসমঞ্চ ছাড়তে হয়। আরো খানিক যেতেই দত্তপাড়া।" [২৩]

'কাক ও কলস' গল্পের ভাষা বর্ণনায় কাব্যময়তা ধরা পড়ে। এ গল্পটি যেন কবির কলমে লেখা। ঋতু বদলের ফলে প্রকৃতির যে রূপ বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে লেখক নিখুঁত বর্ণনায় তা তুলে ধরেন। বর্ষার আগমনে ধরা পড়ে কবির অনুভব—

"পুকুর ছিল। পুকুরে জল ছিল। জলে পদ্ম ছিল।...সংসারের খিদে মেটাতে ব্যাঙ ছিল। ব্যাঙের খাদ্যের জন্যে জলপোকা ছিল। কাছিম আর কাঁকড়ারা ছিল। জৈব ছিল, অজৈব ছিল— অজৈবকে অবলম্বন করে জৈব ছিল।" [২৪]

আবার—

"শ্রাবণে মেঘের রঙ ঘন হয় আকাশের কোলে। মেঘে মেঘে সংঘাত বাধে। বিদ্যুৎ চমকায়। মেঘ ডাকে। বাজ পড়ে বৃষ্টি ঝরে। স্রোত বয়। টিলার পাথর গড়ায়। ভাঙে। টুকরো হয়।" [২৫]

দেখতে দেখতে—

"শরৎ আসে...বীণার তারে হাত রাখে সরস্বতী। লক্ষ্মী নৃত্যের মুদ্রায় দাঁড়ায়। দুর্গার মাতৃস্তনে দুধের বান ডাকে। শরীরে রঙ চাপে। পাটের কাপড় ওঠে। শনের চুল গজায়। সিংহ গর্জন করে। পেঁচা চোখ মেলে। ইঁদুর উঁকি মারে। হাঁস ডানা মেলে। কলা বউ লাজে রাঙা হয়। বউ-ঝিরা বাপের বাড়ি যায়। পাঁঠার মুন্ড খসে। বিসর্জনের বাজনা বাজে। হাঁস ডোবে পুকুরের জলে। বীণা গলে। হাতি চলে অতলে।" [২৬]

এক লহমায় যেন শারদীয়া শেষ হয়। এরপর আসে শীতকাল—

"খেতে সবুজ জৈব হলুদ হয়। শীত জমাট বাঁধে। আমগাছে মুকুল আসে। মুকুলের

বৃদ্ধি ঘটে। আমের শাখায় শাখায় সবুজের দানা ফোটে। পৌষ সংক্রান্তির চালের গুঁড়ি রেণু হয়ে পড়ে।" [২৭]

গল্পে দাঁড়কাকের জল খাওয়া প্রসঙ্গেও ছোটছোট বাক্যে শব্দ যেন ধ্বনিসাম্য তৈরি করে কাব্যময়তায় ধরা রয়েছে—

"দাঁড়কাক কলসির কানায় গিয়ে বসে। উঁকি দেয়। জল আছে। গলা বাড়ায় কলসির গহ্বরে। ঠোঁট যায় না। শরীর বাঁকায়। জলে পৌঁছায় না। শ্বাস টেনে শরীর গোটায়। জল পায় না। গলা-ক্ষীণ কলসির কানায় আটকে যায় দাঁড়কাকের ভারী শরীর।" [২৮]

তিন, চার বা পাঁচটি শব্দে বাক্য গঠন পদ্ধতিতে চমৎকারিত্ব রয়েছে—

"দাঁড় কাক পাথর দেখে। উড়ে গিয়ে পাথরের গায়ে বসে। পাথরের গায়ে দু'ঠোঁট ঘষে। ধার আনে মৃত জীবকোষে। উড়ে যায় শ্মশানের দিকে। কলসির কানায় বসে। জলের মাপ নেয়। কলসির গায়ে বসে ঠোকর মারে। মাটির খুচরো কণা ওড়ে। ছিদ্রের দেখা নেই।" [২৯]

আবার 'গোষ্ঠ' গল্পেও ছোট ছোট বাক্য বিন্যাসে গল্পের বর্ণনা দিয়েছেন—

১) "লক্ষ্মণ পিছপানে ছোটে। তিরতির করে একেবারে। বাঁধের গায়ে। চাটানটার নিচে! সাঁকোটার তলায়। কাটা গাছটার গুঁড়ির পাশে। আবার ছোটে। বড়ো আইড়টার তলায়। কোথাও নাই। (গোষ্ঠ)

২) "হাঁপিয়ে ওঠে লক্ষ্মণ। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। হাত অসাড়। ভেড়াটা পুয়োতি। পেট এলিয়ে শুয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার তাগিদ নেই। অসাড়, নির্বাক চাওনি। আবার একবার ডাক পাড়ে। বেদনা উঠেছে। পিছনে রস ঝরে। ভ্যাবাচ্যাকা খায় লক্ষ্মণ।" (গোষ্ঠ)

'শিল্পী' গল্পের মধ্যেও লেখকের কাব্যময় ভাষা স্বতন্ত্র বাক্য বিন্যাসে ধরা রয়েছে—

"রাত নামে। জোনাকি জ্বলে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, লণ্ঠন আলো ছড়ায়। গিরিমাটি গোলে আমানি। মহাদেবের বউ পলতা পাতা ঘষে মাটির সরায়।"

গল্পের ভাষায় নাটকীয়তা ধরা পড়ে—

"ঘন্টি থেমে যায় হঠাৎ ই দরজার ওপর করাঘাতে। আশা, হতাশা, আনন্দ, দুঃখ, রাগ, অভিমানের বিশ বছরের সমস্ত পুঁজি দরজার ওপর উজাড় করে দিতে চায়। কে হয়ে উঠতে পারে মনে ও শরীরে বিশ বছরের এই তরুণ— আমির ? সলমন ? সইদ ? অজয় ? আদিত্য ? চাকি ? শারুক ?" (ঝুলঝাড়ু)

মৃত্যু সংক্রান্ত ভাবনায় লেখকের বর্ণনা—

"হয়তো এতক্ষণ মানুষটা ঝুলছে তারে। একরোখা মানুষ, সব করতে পারে। গত বছর বিনোদ বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ইলেকট্রিকের তারে ঝুলে মরেছে। সুচাঁদও একবার ঝগড়া করে ধুতরো বিচি খেয়েছিল। মরেনি ভাগ্য! অন্ধকার যত বাড়ে সতুর

মা ভাবনায় তত নিজের মধ্যে গুটিয়ে যায়। ধুতরো বিচি, দড়ি, ট্রেন লাইন আর ইলেকট্রিক তার— এসব গুলো মাথার মধ্যে প্রতি মুহূর্তে আড়াআড়ি নিজেদের কেটেকুটে চলে যায়।" (জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, ঘুঘু কিংবা মানুষ)

টুকরো টুকরো ঘটনা প্রবাহে অসাধারণ চিত্রকল্প নির্মিত হয়েছে কোনো কোনো গল্পে—

"মদনা যেন কেন তাকিয়ে ছিল সেদিন। উপেনের পাশে বসে বাঁশি শোনে সে। আপন মনে কালো পাথরের উপর কাঁকরের লাল ঢেলা দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটে— কখনো ফুল হয়, দেওয়াল ছবির দুটো পাখি, কখনো আধ ফোটা পদ্ম আর ভ্রমর। কালো পাথরের বুকে আবছা লালের টানে মিটমিট করে ওগুলো। বুঝি আপন মনে করে ওসব। তবুও সোয়াস্তি নেই।" (গোষ্ঠ)

কিংবা— শব্দ দিয়ে ছবি আঁকেন গল্পকার—

"একটা মাছরাঙা ছোঁ মেরে পুকুর থেকে তুলে নেয়। কোনো টিকলি মাছ। একটু ঢেউ উঠে ছড়িয়ে পড়ে। সূর্যটা জলে কয়েক টুকরো হয়ে ভেঙে যায়।" (গোষ্ঠ)

অবলীলায় ক্রিয়াপদহীন বাক্যের প্রয়োগ রয়েছে 'গোষ্ঠ' গল্পে—

'বহুদূরে টাউনের আলো।'

'এখন সবাই রাজা।'

'গলাটা খানিক ফাঁকা।'

'ভারি রাতে চারদিক গমগম।'

'গলার স্বর ক্রমশ ক্ষীণ থেকে বোবা।'

আবার অন্যান্য গল্পেও দেখা যায়—

'রূপের চেয়ে বড়ো জিনিস পালিশ।' (সখিনা)

'সখিনার বাপের ঘরের লোক রতন।' (সখিনা)

'শেষে সেই লেখিকার বাড়িতে।' (ঝুলঝাড়ু)

'ফাইলের স্তূপ সামনের টেবিলে।' (ঝুলঝাড়ু)

'জালনপাতি উঠোনে।' (সখিনা)

শব্দচয়ন সম্পর্কে অতি সচেতন ও খুঁতখুঁতে রামকুমার 'আমাদের গ্রাম' গল্পের বয়ানে শব্দের রকমফের তুলে কৌতুক করেছেন, আর তার সাথে সমালোচনাও করেছেন—

১) "মা দুর্গার কৃপায় জগন্নাথ মুখুজ্জে মুতলে (পেচ্ছাব বানানটা গোলমেলে) সোনা ঝরত।"

২) "এপাড়া থেকে ওপাড়া যাবার সময় গৃহস্তের (স-এর নিচে থ বা হ, কি একটা যেন বলেছিল) কাছ থেকে দোখ্যিনা (বেয়াড়া বানান) নেয়।"

৩) "গোয়ালেরও নানান ব্যাবহার (য-ফলার পর আকার হবে ? দেওয়া ভাল। ফাঁকা লাগছে)।"

৪) "কোনখানেই বা পুঁতবে সন্ধ্যামোনি, (মো-এ বেশ ভরাট লাগছে) বেল, জুঁইয়ের গাছ ?"

৫) "সশানের (আবার ঝামেলার বানান) চাতালে বসে ঘুঘু গেরস্তের বাপান্ত করে।"

রামকুমারের কোনো কোনো গল্পে দেখা যায় আগে প্রশ্ন তারপর ব্যক্তি নামের পরিচয়। যেমন—

১) ''কোথায় যাবে গো খুড়ো ? তপন বলে।
দে বাপ, বিড়ি দে', কিষ্ট বলে।'' (লাঙ্গলী)

২) ''আপনাদের আদি গুরু কে ?
কারকবেড়ের কালীসাধক। শাশুড়ি বলে।
তারা কেউ নাইক ? বাবাজি প্রশ্ন করে।
থেকেও না থাকা, রবি বলে।'' (চরৈবেতি)

এখানে 'বলে' শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে 'সমান্তরলতা' (Parallelism) ঘটেছে। এই 'বলে' শব্দের পরিবর্তনে 'উত্তর' শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়—

''বাবাজি বলে, রবি কোথায় গো ?
মাঠে, গোপা উত্তর দেয়।
বাবাজি এসেছিল। কীর্তন শুনতে যেতে বলছিল
যাচ্ছি তো, রবি উত্তর দেয়।'' (চরৈবেতি)

গল্পের বর্ণনায় অনেক আঞ্চলিক শব্দ ধরা রয়েছে। যা রামকুমারের নিজস্ব সম্পদ। নিবিষ্ট পাঠক প্রত্যেকটা রীতি-রেওয়াজের খুঁটিনাটি পরিচয়ে বিশদে জ্ঞান আহরণ করতে পারেন। 'বৌ, মেয়ে, অ্যালসেশিয়ান ও পাইপ' গল্পে 'বিশ বাইশ বছরের মেয়ে দুটো জামা পরেছে— টুটি থেকে মাটি ছুঁই ছুঁই জামা।' 'দুখে-কেওড়া'য় আছে 'ডাক না দিলে পেঙি কুকুরটাও ভাত খাবে না।' এমন ভাবেই 'গোষ্ঠ' গল্পে পাওয়া যায়— 'মেটেলি সাপের বাচ্চা, বাগাল, বুধু এইটুন থেকে, ভেবলি এইটুন থেকে।' 'লড়াটা ধরে টানতে-টানতে লক্ষ্মণের মা ছেলেকে ঘর নিয়ে যায়', কিংবা 'জাড়টা খুব লাগছে।' 'এই রোয়া কাটার মুনিষজন।' 'ঘরের মেয়ে লোকের তাতেই তুপতুপোনি।' 'বাপের ঘরে মেয়ে নে যাবার তখন কি হদহদোনি। বোয়েদের মুখ সব ঝুড়ি— ছাঁ দেখ।" [৩০] এখানেই পাওয়া যায়— 'ব্যাঁত এমন ফাড়া', ফুঁপি গিঁট, গুণছুঁচ'-এর মতো লৌকিক শব্দ।

গ্রাম্য ভাষার অতি সরল ব্যবহার গল্পে গতি সঞ্চার করেছে। 'শিল্পী' গল্পের সংলাপে আঞ্চলিক উপভাষা তথা লৌকিক গ্রাম্য ভাষার পরিচয় রয়েছে—

"হাসে মহাদেব, আঙুল তুলে বলে— 'গাড়ু লিয়ে ভগবান বইস্যা আছে। চাতক ডাকলে গাড়ুর ললটা বাঁকায় দিবেক।'

'কে আছিস বটে ? বলি মাস্টার আর মাস্টারের মাগ আসছে, বলি কি আছিস বটে ?'

'বহিনচোত বাচুর বটে। দুধ খাবার নিশায় পাগোল।''[৩১]

উপরের দৃষ্টান্তে দেখা যায়—

নিয়ে > 'লিয়ে'-ন > ল হয়েছে। বসিয়া > বইস্যা > বসে— অপিনিহিতির বৈশিষ্ট্য। নলটা> ললটা— ন > 'ল'-এ পরিণত 'বটে'-'বট' ধাতুর প্রয়োগে এসেছে। 'মাগ' শব্দটি গ্রামীণ 'বউ' বা 'স্ত্রী' শব্দের সমার্থক। 'বহিনচোত'— স্ল্যাং শব্দ বিশেষ (বানচোত-এর সমার্থক)। বাছুর > 'বাচুর'— মহাপ্রাণবর্ণ অল্পপ্রাণ বর্ণে পরিণত হয়েছে। পাগল > পাগোল— 'অ' স্থলে 'ও' উচ্চারণ।

—এ জাতীয় উপভাষার বৈশিষ্ট্য পশ্চিম রাঢ়ী উপভাষার ভাষা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে।

'দায়বদ্ধ' গল্পে বোকাটে নেতাই-এর দুঃখময় জীবন কথায় উঠে এসেছে জমি ও জমি চাষের জন্য গরু কেনার প্রসঙ্গ। ব্যাঙ্কের লোন নিয়ে গরু কেনার কথা কাপড়ের দোকানদার নিত্য মোড়ল জানতে পেরে একবারে গ্রামের ভাষায় কথা বলেছে। যা বাঁকুড়া জেলার আঞ্চলিক ভাষা বৈশিষ্ট্য—

"সাধে কি আর লোন দিতে চায়নি, তোরা সব তো শোধ দিবিনি। সেদিন ব্লকে গেছলুম, ম্যানেজার বলছিল— হাড়হাভাতেদের দিলে এই তো গোলমাল। রাইসমিল, বাস কোম্পানি কি বড়ো ব্যাবসাদারদের দিলে ই ভয়টি তো থাকবেনি যে মেরে লিবে।"

(দায়বদ্ধ)

চলমান জীবনে যে অজস্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, শিল্পের উপস্থাপনায় নিজস্ব বিন্যাসে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ছোটগল্পের মাধ্যমে তা তুলে ধরেন গল্পকার রামকুমার মুখোপাধ্যায়। 'সমুদ্রতটে ওরা দশজন' গল্পে আবহমান কাল প্রবাহে মানুষ ও সমুদ্রের সম্পর্কের রসায়নকে সমুদ্র দেখতে আসা বিভিন্ন বয়সের মানুষের সাথে চিরন্তন করে তুলেছেন ভাষার মাধ্যমে—

"শিশু দুটি বলে— কি সুন্দর! সমুদ্রের তীরে যদি পার্ক করে দিত! কিশোর-কিশোরী বলে— আরো নির্জন হবে ভেবেছিলাম। প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া বলে— সমুদ্রতীরে জমির দাম বড়ো বেড়ে গেছে। চুরি ছিনতাইও হচ্ছে। পুলিশ দেয় না কেন ?

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বলে— সাগরদ্বীপের মতো সমুদ্রতীরে কপিল মুনি বা অন্য কারো একটা আশ্রম করলে ভাল হয়।

যুবক-যুবতী শুধু নির্বাক থাকে। তাদের সমুদ্র-সৈকতের রাত সমাজ অনুমোদন করে না।" [৩২]

নির্জনতা, সামাজিক অনুশাসন অপার ও অসীম সমুদ্রের অনন্ত রহস্যের মতো প্রেমের অবগাহন বয়সের অনুশাসন ও পৌরাণিক আবহে সমকালের প্রত্যক্ষ ভাবনা লেখকের সজাগ দৃষ্টিতে বাস্তবতার আলোকে চিহ্নায়ক হয়েছে।

অনিল ঘড়াই

অনিল ঘড়াই-এর গল্পে রয়েছে গ্রাম্যসরল জীবনচর্চা, বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব, সংঘাতের মধ্যদিয়ে ব্যক্তি মানসের অন্তরঙ্গ নির্জনতা, সংযত প্রকাশভঙ্গিমা, ছন্দোময় ভাবাবেগ, বস্তুনিষ্ঠা, অন্ত্যজ শ্রেণির সামাজিকতা, সামাজিক কুসংস্কার, অর্থনৈতিক দৈন্যতা, লৌকিক ভাষার যথার্থরূপ। এমনকি সমাজপতিদের অত্যাচার, নিষ্পেষণ, অন্ত্যজ সমাজের প্রতি তীব্র অবজ্ঞা কোনটাই তার সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কাব্যিক চেতনাময় উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ ভাষার মাধ্যমে তার-ই প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর ছোটগল্পে ব্যবহৃত ভাষারীতি যথেষ্ট প্রশংসনীয়। যেমন—

ক) ক্রিয়াপদহীন বাক্যগঠনের মাধ্যমে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন লেখক। যথা—

১. 'বাবুর চোখে আশার ফুলকি।' (ন্যাসা বাগ্‌দি শেয়াল ধরতে যায়)

২. 'সেদিনের সেই ছোট্ট টিকলি আজ চোদ্দ-পনের বছরের কিশোরী।' (টিকলি)

৩. 'তাদের মধ্যে বড়টার নাম মাধব। ছোটটার নাম যাদব। ওরা দুই ভাই। কামিনীর গর্ভের সন্তান।' (রক্ত)

খ) অনিল ঘড়াইয়ের গল্পের প্রসাদগুণের অন্যতম উপাদান তাঁর কবিত্ব শক্তি। তাঁর কাব্যিক চেতনাময় উপলব্ধি গল্পগুলিকে উচ্চাসনে বসিয়েছে। যেমন—

১. 'রোদ ফোটে বাঁশ বাগান আর আমবাগানের ফাঁক-ফোকরে। গোরু-মোষগুলো দল বেঁধে চরতে বেরল মাঠে।...হাওয়া ছুটছে, ধূলো উড়ছে। যেন হাওয়ার সাথে ধূলো হাডুডু খেলছে সাত সকালে।' (খরা)

২. 'তখন বাবলা গাছের মাথায় তারায় ভর্তি আকাশ আখক্ষেতে হাওয়ার ছেলেমানুষী দৌড়-ঝাঁপ, ধবল মেঘের উপর হালকা নীলের ওড়না।' (লাশ খালাস)

গ) বেশিরভাগ গল্পে বাক্যের দৈর্ঘ্য ছোট হলেও দু-একটি গল্পে দীর্ঘ বাক্য বিন্যাস দেখা যায়—

'লাট্টু তখন স্কুলের শেষের ক্লাসে, একদিন দুম্ করে পড়া ছেড়ে দিল সে— মায়ের রুগন্ মুখের দিকে তাকিয়ে সে হাত কামড়াল, হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল উপার্জনের রাস্তা।' (লু)

ঘ) বর্ণনার ভাষা :

১. প্রকৃতি বর্ণনা— 'গ্রামের রাত। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলেই ঝিঁ-ঝিঁ ডাকা পথঘাট। তবু এই অশান্তির মাঝেই চাঁদ উঠেছে খলবলিয়ে, নীল আকাশে বেলিফুলের সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে আছে গোটা গোটা তারা।' (পোকাপার্বণ)

২. রেললাইনের বর্ণনা— 'রেললাইন চলে গিয়েছে এঁকেবেঁকে, রোদে চকচক করে ধাতব পাত— খোলা তরোয়াল যেন ঝল্‌কায়— তার চারপাশে গিট্টি পাথরগুলো দানবের চোখের চেয়েও কট্‌কটায়।' (লু)

ঙ) একটি শব্দ বা ক্ষুদ্র বাক্যের বারবার প্রয়োগে বাগ্‌ভঙ্গির সমান্তরালতা (Parallelism) দেখা যায়। যেমন—

১. 'টিকলি আমাদের মেয়ে নয়, মেয়ের মত।' (টিকলি)

২. 'বাবার জন্য গর্ববোধ হতো লাট্টুর— গর্বটা এমনই মধুর।' (লু)

চ) অনিল ঘড়াই-এর গল্পে মেদিনীপুরের এগরা, কাঁথি, রামনগর ছাড়াও নদিয়ার দেবগ্রাম-পলাশী-বেলডাঙ্গা প্রভৃতি এলাকার মানুষ ও তাদের জীবন কথা কথ্যভাষায় চিত্রিত। তাই এই সব অঞ্চলের কথ্যভাষা গল্পের চরিত্রগুলির মুখে মানানসই হয়েছে। 'পরীযান' গল্পের পটভূমি অনিলের গ্রাম রুক্মিণীপুর। এই অঞ্চলের কথ্যভাষা 'পরীযানে' রয়েছে। বুড়ো বলে— পরীযান হিলা পালকি। সাজিই গুছিই রাখা পালকি। এতে চাপিকি তোর মেনকার মত ছুয়া-মায়াঝি'রা ব্যা হিতে যায়। যাওয়ার সময় গাল ফুলিই কি কাঁদে—'[৩৩] আবার 'খরা' গল্পের পটভূমি কেসনগর। এই গল্পের ভাষা 'অত সস্তায় অমন পাপ আমার দ্বারা হবেনি ? ...মাস্টুরকে বলো গে যাও বে দে দিতে। বুড়ো বয়সে এ সব পাপ ভাল্ল্ লাগে না। ধরা পড়লে পিঠের ছাল খুলে মলম লাগিয়ে দেবে। তখুন জান নিয়ে ফেরা সমিস্যে।'[৩৪]

অনিলের গল্পে দেহমিলনের মতো প্রসঙ্গ প্রচুর রয়েছে, তবে তার বর্ণনা ইঙ্গিতবাদী ও সংযত। আর এ ব্যাপারে অতিরিক্ত শিল্প সচেতন লেখক অনিল। 'নাগর' গল্পে— সুধাদাস 'ঠোঁটে ঠোঁট ঘসে। স্বপ্নাচ্ছন্ন গভীর দু'চোখে লেপটে দেয় তৃষিত অধর। স্ফীতকায়, সুসংবদ্ধ কোমল পেলব বুকের জাগরিত স্পন্দনে নিমেষে জেগে ওঠে পুরুষ হৃদয়ের নিদ্রিত ঘোড়া।' 'কাকমারা' গল্পে ভিক্ষাস্বর ও পার্বতীর মিলনের বাসর রচিত হয়েছে কেয়াবনে— 'খালধারে কেয়াবনের পাশে তখন দুটো সাপের শঙ্খ লেগেছে। বাতাস চমকে উঠছে কেয়া ফুলের সুঘ্রাণে, শরীর নিঙড়ানো সৃষ্টির মাদকতায়। দুটো শরীরের তখন তোলপাড়, হাজার আলোর বিচ্ছুরণ।' এই গল্পে কাকমারা সম্প্রদায়ের ভাষা তুলে ধরেছেন লেখক— 'গত সনে অমন সুন্দর সীতার মতন বহুকে যখন তু মহাজনের ঘরে দে এলি। আপনাকে বড় শারমিন্দা লাগল। সেই থিকে এ পয়সা আমি বাঁশ খুঁটিতে ঢেলেছি, পেট বড় হারাম। কব্ বিনে কব্ খরচ হয়ে যায়—।' সিংভূম, উত্তর চব্বিশ পরগণা বা মেদিনীপুর জেলার আঞ্চলিক শব্দ তাঁর ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও শক্তি। যেমন কয়েকটি আঞ্চলিক শব্দ হল— পাছিয়া (ঝুড়ি), ছিমুতে (নিকটে), কুনঠি (কোথায়), পনিক (বটি), ছঁচ (ন্যাতা), খলাবাহির (উঠোন), পড়তা (লাভটা) ইত্যাদি শব্দ সাবলীল ভাবে ব্যবহার করেছেন। অনিল ঘড়াই-এর ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গে অমর মিত্র 'অনিল আমার অনুজপ্রতিম' লেখায় বলেন— 'অনিল চমৎকার মেলাতে পারেন গ্রামীণ উপভাষাকে। তার গদ্য বর্ণনাময়।'[৩৫] পরিশীলিত ভাষার ভেতরে গ্রামীণ উপভাষা ও লোকভাষাকে নিম্নবর্গের অসহায় মানুষগুলির জীবন-কথায় ব্যক্ত করেছেন অনিল ঘড়াই।

সূত্রনির্দেশ

১. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯৮, পৃ. ১৫

২. Edger H. Sturtevant, An Introduction to Linguistic Science, New Heaven : Yale University Press, 5th Printing, March, 1956, Ch.- I, p- 2.

৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা প্রকাশনী, জানুয়ারি, ২০০৩, পৃ. ২

৪. Charles F. Hockett, A Course in Modern Linguistics, New York, The Macmillan Company, 1968, p- 553

৫. তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১ম প্রকাশ, সপ্তম মুদ্রণ, ২০০৫, পৃ. ১২৫

৬. অভিজিৎ মজুমদার, শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, ৩য় সং, ২০১৬, পৃ. ১১৭

৭. তদেব, পৃ. ৫

৮. পবিত্র সরকার, গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক, ২য় সং, ২০০২, পৃ. ১৭৭

৯. তদেব, পৃ. ১৮৬

১০. তদেব, পৃ. ১৮৪

১১. ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ভাষাতত্ত্ব, মণ্ডল বুক হাউস, ষষ্ঠ সং, ২০০৬, পৃ. ৬০

১২. বাংলা গল্প ও গল্পকার (৩), সম্পাদনা সুবল সামন্ত, এবং মুশায়েরা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৩

১৩. ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ভাষাতত্ত্ব, মণ্ডল বুক হাউস, ষষ্ঠ সং, পৃ. ৫৪

১৪. সমকালের গল্প উপন্যাস : প্রত্যাখানের ভাষা, রুশতী সেন, পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ. ৫০

১৫. অমর মিত্র, সেরা ৫০ টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ৪৫৫

১৬. ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ভাষাতত্ত্ব, মণ্ডল বুক হাউস, ষষ্ঠ সং, পৃ. ৫৪-৫৫

১৭. ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা, ভাষাতত্ত্ব, মণ্ডল বুক হাউস, ষষ্ঠ সং, পৃ. ৫৭-৫৮

১৮. ড. রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, ৩য় সং. ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৫৭

১৯. শ্রেষ্ঠ গল্প, নলিনী বেরা, করুণা প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ২০০

২০. তদেব, পৃ. ৮২

২১. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, গল্প সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০১২, পৃ. ১১১

২২. তদেব, পৃ. ১১৩

২৩. তদেব, পৃ. ২৬৩

২৪. তদেব, পৃ. ৩৬৭

২৫. তদেব, পৃ. ৩৬৮

২৬. তদেব, পৃ. ৩৬৮

২৭. তদেব, পৃ. ৩৬৯

২৮. তদেব, পৃ. ৩৭২

২৯. তদেব, পৃ. ৩৭২

৩০. তদেব, পৃ. ৭৯

৩১. তদেব, পৃ. ৪৩৫-৪৩৬

৩২. তদেব, পৃ. ১২৯

৩৩. অনিল ঘড়াই, পরীযান ও অন্যান্য গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সং, ২০০৩, পৃ. ১৫

৩৪. তদেব, পৃ. ৯৪

৩৫. শাশ্বত ছিন্নপত্র, অনিল ঘড়াই সংখ্যা, বালিঘাই, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০০৪, পৃ. ৩৭৬